প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৫ ❖ ২৭ সেপ্টেম্বর - ৩ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

প্রবীণেরা পরিবারেই ভাল থাকুক

নবীন জীবনে প্রবীণজনেরা অনুপ্রেরণা ও সুপরামর্শদাতা

বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা দেশী না বিদেশী

রাজশাহী ডাইয়োসিসের বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা-২০২০ খ্রিস্টাব্দ
মূলসুর : আমরা হলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক

পিতার গৃহে ৮ম বছর

মিতালী মেরীলিন কস্তা
জন্ম: সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৭১
প্রয়াণ: অক্টোবর ০১, ২০১২

"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে"

মৃত্যু মানে কেবলই একটা জীবনের ইতি, একটা শরীরের পরিসমাপ্তি। তা কখনেই সম্পর্কের শেষ নয়।

মা মিতালী,
সময়ের আবর্তনে পেরিয়ে গেছে আটটি বছর, তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রয়ে পরম দেশে চলে গেছো । তুমি আমাদের মাঝে নেই তাও মেনে নিতে কষ্ট হয়। তোমার স্থান আজও কেউ পূরণ করতে পারেনি। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। তোমার স্মৃতি বিজড়িত মুহূর্তগুলো মনে করে চোখের কোণে অশ্রু জমে। তোমার অপরিসীম ভালবাসা, সেবা-যত্ন, শাসন প্রতিনিয়তই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছো। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো, যেন আমরা জীবন শেষে তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি। "আসলে তাদের মৃত্যু নেই, কেননা তারা স্বর্গদূতদেরই মতো, আর পুনরুত্থানে সঞ্জীবিত বলে তারা ঈশ্বরেরই সন্তান। (লুক ২০:৩৬)"

তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনায়

তোমারই শোকাহত বাবা-মা।
সুনীল সেলেষ্টিন কস্তা ও মঞ্জু মারিয়া কস্তা।
ক-২২/এ নন্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২.

বিজ্ঞ/১৫৫/২০

এসেছি সবাই অতিথি হয়ে
পৃথিবীর এই রঙ্গমঞ্চে
চলে যেতে হবে শূন্য হাতে
রয়ে যাবে সব এ ধরাতে

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ঐশী প্যাট্রেসিয়া ডি' কস্তা
জন্ম: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩
মৃত্যু: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭

দেখতে-দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চিরবিদায়ের তিন বছর। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে। তুমি আমাদের মাঝে নেই এটা মেনে নিতে আজও অনেক কষ্ট হয়। তুমি সবসময় আছ এবং থাকবে আমাদের মনোমন্দিরে। তুমি ছিলে আমাদের সবার চোখের মণি, আমাদের হাসি-খুশি আনন্দ সব। তুমি ছাড়া এখন সবকিছুই শূন্য- তোমার শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে আমরা অনুভব করছি। মাগো তোমাকে ছেড়ে অনেক কষ্টে বেঁচে আছি শুধু মনে হয় তুমি হঠাৎ এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে মা বলে ডাকবে। তোমাকে ছেড়ে বেঁচে থাকা কেবলই বেঁচে থাকার তাগিদে মাত্র।

এ সুন্দরতম পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বেদনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে স্বর্গের দিকে, যেখানে প্রতিটি মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল। রেখে গেছ মাগো অনেক স্মৃতি, তোমার হাসিভরা মুখ, তোমার লেখাপড়ার বইখাতা এখনো গুছিয়ে রেখেছি, খাতার মধ্যে তোমার লেখাগুলো পড়লে দুচোখে জলে ভরে আসে। চারপাশে সবকিছু আছে, সব আছে কিন্তু তুমি নেই মা এটা মেনে নিতে পারি না। তুমি আমার হাতটি ছেড়ে কিভাবে চলে গেলে?

মাগো, আমি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না শুধু মাঝে-মাঝে প্রকাশ করি। আর বেশি কষ্টের সময় তোমার ছবির সামনে দাঁড়াই, দুঃখের কথা বলি আর বলি মাগো আমাদের সঙ্গে থাক। মাগো তোমার স্মৃতি ঘিরেই বেঁচে আছি এবং থাকবো। তুমি মা আমাদের সবার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক আশীর্বাদ ও শান্তি এনে দাও। এই তোমার কাছে মিনতি ও প্রার্থনা। তুমি মা ঈশ্বরের স্বর্গীয় আলোতে আলোকিত হয়ে থাক। আমরা সবাই এই প্রার্থনা করি।

শোর্কাত পরিবারের পক্ষে থেকে
বাবা-মা: ডেনিস ও রানী ডি' কস্তা
ছোট বোন: ঐশ্বর্য ডি' কস্তা
দিদিমা: পুষ্প প্যাট্রেসিয় গমেজ
এবং মামা ও মামীর পরিবারবর্গ
মহাখালী খ্রিস্টান পাড়া

বিজ্ঞ/১৫৬/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩৫
■■■■■ ২৭ সেপ্টেম্বর - ০৩ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১২-১৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রবীণদের পাশে থাকি তাদেরকে ভাল রাখি

মানব জীবনচক্রের একটি স্বাভাবিক অধ্যায় প্রৌঢ়ত্ব। স্বাভাবিক হলেও তা কঠিন বাস্তবতা। কেননা একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠা ও সফল করতে জীবনের অনেকটি বছর প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সফল হন। যখন সফলতা নিয়ে দুর্বার গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলবেন তখনই প্রৌঢ়ত্ব তাকে কিছুটা স্থবির করে পিছনের দিকে টেনে ধরে। সবকিছু থাকার পরেও সামনের দিকে এগিয়ে চলতে না পারা, একজন প্রবীণকে ভীষণ কষ্ট দেয়। তাইতো প্রৌঢ়ত্ব ব্যক্তিজীবনে একটি কঠিন বাস্তবতা। এই কঠিন বাস্তবতাকে আরো বেশি রূঢ় করে দেয় প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের বিপরীতমুখী আচরণ। যে সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য প্রবীণ ব্যক্তিটি নিজের রক্তের শেষবিন্দু পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের কাছ থেকে অবজ্ঞা, অবহেলা, উদাসীনতা, অমনোযোগিতা ও অযত্ন পেলে এ সুন্দর জগতটা নরকে পরিণত হয় তার কাছে। তখন প্রবীণ ব্যক্তিটির বেঁচে থাকার স্পৃহাটাই কমে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের প্রবীণেরা আগের মতো পরিবারের আপনজনদের কাছ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা, সেবা পাচ্ছে না। অযত্নে, অবহেলায়, হতাশা-নিরাশায় ও নিসঙ্গতায় দিন যাপন করতে-করতে এক সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক পরিবারের মত আমাদের পরিবারেও কি প্রবীণ ব্যক্তিরা বঞ্চিত ও অবহেলার শিকার! যে প্রবীণেরা পরিবার ও সমাজের কল্যাণ করে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করাওতো আমাদের সকলের দায়িত্ব।

প্রবীণদের বার্ধক্য, স্বাস্থ্য সমস্যা, কর্মক্ষমতা, পরিবার হতে বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ও অসহায়ত্ব ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে গুরুত্ব দিয়ে তাদের কল্যাণের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের মধ্যদিয়ে সকলকে প্রবীণদের প্রতি আরো সংবেদনশীল হবার আহ্বান রাখছে। পবিত্র বাইবেল 'বৎস, তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার যত্ন নিও' বলার মধ্যদিয়ে সকলকে সচেতন করছে প্রবীণদের প্রতি যত্নশীল হতে। পোপ ফ্রান্সিস যুবাদেরকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, যুব বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের দাদু-ঠাকুমাদের সাথে সময় কাটাতে বিরক্ত হয়ে না। তাদের কাছ থেকে জীবন পরিচালনা করার শিক্ষা নাও। কেননা তারা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ও জীবন সংগ্রামে পারদর্শী। বাংলাদেশ সরকারও প্রবীণদের কষ্টের বিষয়টি উপলব্ধি করেছে এবং নাগরিকদের আহ্বান করছে বয়স্ক নাগরিকদের যেন বিশেষ সম্মান ও সুযোগ দেওয়া হয়। সন্তানেরা পিতামাতাদের দায়িত্ব নিতে যেন অনীহা না করে তার জন্য আইনের কথাও চিন্তা করছেন। মাননীয় সরকারের এই সুন্দর চিন্তাগুলো যখন পরিবারে প্রবেশ করবে ও অনুশীলন হবে, তখনই কেবল প্রবীণ ব্যক্তিরা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারবে।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না পরিবারের সুখ-শান্তি সমৃদ্ধির জন্য প্রবীণদের অবদান অপরিসীম। প্রবীণেরা তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতা দ্বারা পরিবারের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য সাহায্য করে। সমাজ ও মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রয়োজনেও তারা উদারভাবে সাড়া দিচ্ছেন। প্রবীণদের প্রশংসা ও স্বীকৃতি জানানো দরকার। প্রবীণদের সব চাহিদা হয়তো পূরণ করা সন্তানদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্গ, সময়, স্বীকৃতি, তাদের পাশে থাকতে তো কোন অর্থের দরকার হয় না। এগুলো পেলেই তো তাদের মন আনন্দে ভরে থাকে।

প্রবীণদেরকে বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। প্রৌঢ়ত্বকে উপভোগ করার জন্য মানসিকতা অর্জন করতে হবে। আর নবীনদেরকেও প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। কেননা তারাও একদিন প্রবীণ হবে। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা আর নবীনদের উদ্যোগের সম্মিলনের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারবো কল্যাণকর এক মিলনসমাজ ॥ ✝

মঙ্গলবাণী

"যিশু বললেন, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।" -মথি ২১:৪৩

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

HAGGAI INSTITUTE
BANGLADESH

National Virtual Seminar by HIAAB (23 Oct-13 Nov 2020)

Haggai Institute Alumni Association Bangladesh (HIAAB) will conduct a 07-Day National Virtual Seminar (NS) from 23 Oct., 2020 to 13 Nov. 2020 every weekends (4 hours per day).

- This training prepares interested participants attending 25-Day HI International Leaders Experience at Maui, Hawaii, USA in a meaningful way. This training seminar is a miniature version of HI International Training. HI International training covers about 14-15 subjects while National Seminar covers 7-8 subjects. Certificate of participation will be awarded on the closing day.

Criteria for selection are:

1) Both male/female of Christian faith & age 25 years plus but below 55;
2) Education: Minimum a bachelor degree;
3) Church affiliation is a must;
4) Must attend full 7-days program online on time;
5) Desire to work for His Kingdom.

- Seat will be allotted on first-come-first-serve basis if criteria are fulfilled & seat is still vacant.
- National and International faculties are facilitators of the program.
- Weekly training sessions start at 5:00 pm and closes at 9:00pm.
- Registration charge is Tk1,000/= (One thousand taka only) per person. Any Christian organization/NGO can send group participant. Registration closes by 07 Oct., 2020.

For NS registration and to obtain the NS Form please contact:

Name	Mobile No.	E-mail
Sr Lipy Gloria Rozario	+8801751 499056	rozariogloria@gmail.com
Marshia Mili Gomes	+88 01715100147	marshiamili@yahoo.com
Bartha Giti Baroi	+88 01988008541	bgbaroi@gmail.com
Angela Biswas	+88 01712151213	angela.s.biswas@gmail.com
Aparna Sarkar	+88 01740094105	apornasarkar@yahoo.com
Isaac Rana Banik	+88 01731578137	isaacbanik@gmail.com
Rev Abdul Mahed Chowdhury	+88 01819211728	[illegible]@gmail.com
Ms Shikha Karmakar	+88 01712239044	s.karmakar@awana.org

Joseph Lawrence
President, HIAAB
Mob.: +8801730589237
E-mail: jolawrence1948@gmail.com

Dr Edward P. Rozario
Secretary, HIAAB
Mob: +8801914389590
E-mail: dredwardprozario@gmail.com

শোক সংবাদ

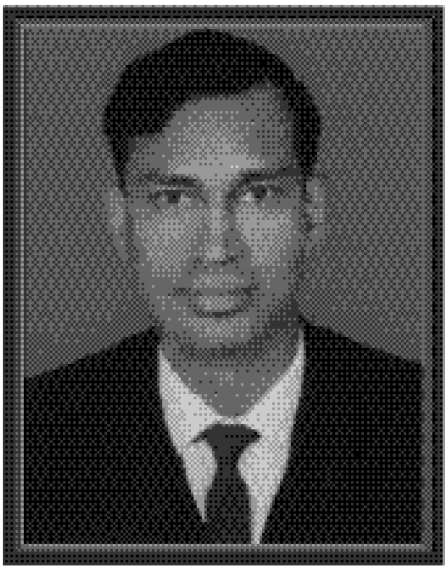

নাম: রবার্ট ডি' রোজারিও
জন্ম: ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১১৫/৪ গ্রীনরোড, ঢাকা-১২১৫

অতি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রিয় বাবা মি. রবার্ট ডি' রোজারিও গত ১১ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার ব্রেন স্ট্রোক করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। যারা তার মৃত্যুর সময় আমাদের পাশে থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমবেদনা জানিয়েছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ধন্যবাদান্তে
শোকার্ত পরিবারবর্গ

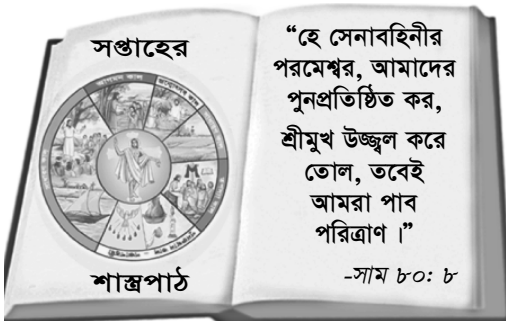

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৭ সেপ্টেম্বর - ০৩ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার

এজেকিয়েল ১৮: ২৫-২৮, সাম ২৫: ৪-৯, ফিলিপ্পীয় ২: ১-১১ (অথবা (১-৫), মথি ২১: ২৮-৩২

২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার

সাধু ভেন্সেচলাস, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস, সাধু লরেন্স রুইজ ও সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

জোব ১: ৬-২২, সাম ১৭: ১-৩, ৬-৭, লুক ৯: ৪৬-৫০

পোপ ১ম জন পলের মৃত্যুবার্ষিকী

২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার

মহাদূত মাইকেল, গাব্রিয়েল ও রাফায়েল, পর্ব দিবস

মহাদূতগণের ধন্যবাদিকা স্তুতি

দানিয়েল ৭: ৯-১০, ১৩-১৪ অথবা ১২: ৭-১২, সাম ১৩৭: ১-৫, যোহন ১: ৪৭-৫১

৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার

সাধু জেরোম, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস

জোব ৯: ১-১২, ১৪-১৬, সাম ৮৮: ৯-১৪, লুক ৯: ৫৭-৬২

১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার

বালক যিশু ভক্তা সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণ দিবস

যোব ১৯: ২১-২৭, সাম ২৭: ৭-৯, ১৩-১৪, লুক ১০: ১-১২

২ অক্টোবর শুক্রবার

পবিত্র রক্ষীদূতগণ, স্মরণ দিবস

যাত্রা ২৩: ২০-২৩, সাম ৯০: ১-৬, ১০-১১, মথি ১৮: ১-৫, ১০

৩ অক্টোবর শনিবার

যোব ৪২: ১-৩, ৫-৬, ১২-১৬, সাম ১১৯: ৬৬, ৭১, ৭৫, ৯১, ১২৫, ১৩০, লুক ১০: ১৭-২৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার

+ ১৯৭৪ ফাদার এত্তোরে বেল্লিনাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮২ ব্রাদ্রার বার্টিন যোসেপ করমিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম ডভক্টোয়ার আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার

+ ২০০৫ ফাদার পিয়েত্রো এডমন্ডো লামান্না এসএক্স

৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার

+ ২০০০ সিস্টার এম ফ্রান্সিলিয়া ম্যাগী সিএসসি

২ অক্টোবর শুক্রবার

+ ১৯৪৫ বিশপ তিমথি জে ক্রাউলি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬৯ সিস্টার লরেট ভার্ভিল সিএসসি
+ ২০১৪ ফাদার জর্জিও সিয়াভি পিমে (দিনাজপুর)

৩ অক্টোবর শনিবার

+ ১৮৫৭ ফাদার সিজার কাত্তানেও পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী মেরিলীন এসএমআরএ (ঢাকা)

ধর্মবিশ্বাস ও দীক্ষাস্নান

১২৫৫ দীক্ষাস্নানের অনুগ্রহের বিকাশ লাভের জন্য মাতাপিতার সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপিতামাতার ভূমিকাও তদ্রুপ: তাদের হতে হবে দৃঢ় খ্রিস্টবিশ্বাসী, নবদীক্ষিত শিশু অথবা প্রাপ্ত বয়স্কদের খ্রিস্টীয় জীবনের পথে পরিচালনা দিতে সক্ষম ও প্রস্তুত। তাদের কর্তব্য হচ্ছে একটি সত্যিকারের মাণ্ডলিক দায়িত্ব (Officium)। দীক্ষাস্নানে প্রদত্ত অনুগ্রহের বিকাশ ও সংরক্ষণে সমগ্র মাণ্ডলীক সমাজই কিছু না কিছু দায়িত্ব বহন করে।

দীক্ষাস্নান কে দিতে পারে

১২৫৬ দীক্ষাস্নান সংস্কারের সাধারণ অনুষ্ঠাতা হচ্ছেন বিশপ ও যাজক, এবং লাতিন মণ্ডলীতে ডিকনও। প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তি, এমন কি, অ-দীক্ষাস্নান, ব্যক্তি, প্রয়োজনীয় সদিচ্ছাসমেত দীক্ষাস্নানের ত্রিত্বিক অনুমন্ত্র প্রয়োগ করে দীক্ষাস্নান প্রদান করতে পারে। প্রয়োজনীয় সদিচ্ছা হল দীক্ষাস্নান প্রদানে খ্রিস্টমণ্ডলী যা করে তা-ই করার ইচ্ছা। খ্রিস্টমণ্ডলী ব্যবস্থার যুক্তি খুঁজে পায় ঈশ্বরের সর্বজনীন ত্রাণদায়ী ইচ্ছার মধ্যে এবং পরিত্রাণের জন্য দীক্ষাস্নানের আবশ্যকতার মধ্যে।

দীক্ষাস্নানের আবশ্যকতা

১২৫৭ প্রভু নিজেই দৃঢ়ভাবে বলেন যে, পরিত্রাণের জন্য দীক্ষস্নান আবশ্যক। তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদেরও আদেশ করেন সকল জাতির নিকট মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করতে এবং তাদের দীক্ষাস্নাত করতে। যাদের নিকট মঙ্গলবার্তা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা এই সংস্কার লাভের সুযোগ পেয়েছে, তাদের পরিত্রাণের জন্য দীক্ষাস্নান আবশ্যক। দীক্ষাস্নান ব্যাতীত খ্রিস্টমণ্ডলীর অন্যকোন পন্থা জানা নেই, যা অনন্ত জীবনের পরমসুখে প্রবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারে; এই জন্যই খ্রিস্টমণ্ডলী যত্নশীল যাতে প্রভুর নিকট থেকে প্রাপ্ত মিশনদায়িত্বের অবহেলা না হয়; এবং খ্রিস্টমণ্ডলীকে দেখতে হয়, যারা দীক্ষাস্নান গ্রহণের উপযোগী তারা সকলেই যেন "জল ও আত্মায় পুনর্জন্ম লাভ করে"। ঈশ্বর দীক্ষাস্নান সংস্কারে পরিত্রাণ বেঁধে দিয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর সংস্কারসমূহ দ্বারা আবদ্ধ নন।

১২৫৮ খ্রিস্টমণ্ডলী সবসময়ই এই দৃঢ়প্রত্যয় ধারণ করে আসছে যে, খ্রিস্টবিশ্বাসের জন্য দীক্ষাস্নান লাভ না ক'রে যারা মৃত্যুরবণ করে, তারা খ্রিস্টের জন্য এবং খ্রিস্টের সঙ্গে তাদের মৃত্যু দ্বারা দীক্ষাস্নাত হয়। দীক্ষাস্নান-ইচ্ছা করার মতই রক্তের দীক্ষাস্নান, সংস্কার না হয়েও সংস্কারের ফলসকল বয়ে আনে।

১২৫৯ দীক্ষাপ্রার্থীগণ যারা দীক্ষাস্নানের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, দীক্ষাস্নান গ্রহণে তাদের সুস্পষ্ট ইচ্ছা, সেই সঙ্গে তাদের পাপের জন্য অনুতাপ, এবং ভ্রাতৃপ্রেম পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দান করে, যা তারা সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

১২৬০ "খ্রিস্ট যেহেতু সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যেহেতু সকল মানুষই প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন গন্তব্যে আহূত, আর সে গন্তব্য ঐশরিক, সেহেতু আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, পবিত্র আত্মা সকলকে স্বয়ং ঈশ্বরের জানা উপায়ে নিস্তার-রহস্যের সহভাগী হওয়ার সম্ভাবনা দিয়ে থাকেন। যে সকল মানুষ খ্রিস্টের মঙ্গলবাণী এবং তাঁর মণ্ডলীর সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ তারা সত্যেও অন্বেষণ করে এবং তাদের বোধশক্তি অনুযায়ী ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, তারাও পরিত্রাণ পেতে পারে। এটা ধরে নেওয়া যায় যে, ঐ ধরনের মানুষ সুস্পষ্টরূপেই দীক্ষাস্নান লাভের ইচ্ছা করত, যদি তার প্রয়োজন তারা জানত।

১২৬১ যে-সকল শিশু দীক্ষাস্নান না পেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, খ্রিস্টমণ্ডলী তাদেরকে শুধু ঈশ্বরের দয়ার উপর ছেড়ে দিতে পারে, যেমনটি সে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-অনুষ্ঠানে তাদের জন্য করে থাকে। বাস্তবিকই, ঈশ্বর তাঁর মহান করুণায় বাসনা করেন যেন সকল মানুষ পরিত্রাণ পায় এবং "শিশুদের প্রতি যিশুর কোমলতা মিশ্রিত উক্তি, শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিও না," এরই প্রেক্ষিতে আমরা আশা করতে পারি যে, যে শিশুরা দীক্ষাস্নান লাভ না ক'রে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরও পরিত্রাণের পথ রয়েছে। খ্রিস্টমণ্ডলীর এক জরুরী আহ্বান: পবিত্র দীক্ষাস্নানের দানের মাধ্যমে খ্রিস্টের কাছে আসতে কেউ যেন শিশুদের বাঁধা না দেয়।

প্রবীণেরা পরিবারেই ভাল থাকুক

মানুয়েল চাম্বুগং

চার বছর আগে ইণ্ডিয়ান এক দম্পতি বনানী সেমিনারীতে সাপ্তাহিক খ্রিস্টযাগে প্রতিদিন যোগ দিতেন। গুলশানের হলি আর্টিজেনে সন্ত্রাসীদের হামলার পর তাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ায় বেশ কিছুদিন ধরে তাদের শুন্যতা গির্জায় অনুভব করেছিলাম। কারণ প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগে তাদের গভীর বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অংশগ্রহণ আমাকে আরো বেশি উপাসনায় মনোযোগী করতো। সেমিনারীতে তাদের আধ্যাত্মিকময় বিচরণ আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। আমি অবাক হয়ে এই দম্পতিদের দিকে তাকিয়ে দেখতাম; বিশেষ করে প্রতি রবিবারে এই সুখী দম্পতিরা তাদের বৃদ্ধা এক বুড়ি-মাকে গির্জায় নিয়ে আসতেন। যত্ন সহকারে গাড়ি থেকে বৃদ্ধা-মাকে বের করে উপাসনালয়ে নিয়ে যেতেন এবং গির্জার শেষে আবার একইভাবে খুবই যত্নসহকারে গাড়িতে উঠিয়ে বাসায় চলে যেতেন। আমাদের প্রতিটি পরিবারেরও উচিত এই দম্পতিদের মতো প্রবীণদের সেবা করা। কারণ এই প্রবীণরাই তো সারাজীবন পরিবারের মঙ্গলের জন্য নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। গড়েছেন আমার, আপনার, সবার জন্য সুন্দর এ আবাসভূমি। সঞ্চিত করেছেন অনেক ধনদৌলত।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বহির্বিশ্বের সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রবীণেরা আগের মতো পরিবারের আপনজনের কাছ থেকে সম্মান, শ্রদ্ধা, সেবা পাচ্ছে না। অযত্নে অবহেলায়, হতাশায়, নিরাশায় ও নিসঙ্গতায় দিন যাপন করতে-করতে এক সময় তাদের পরপারে চলে যেতে হয়। শৈশবে নিজ চোখে আমি এক বৃদ্ধাকে অনেক কষ্ট সহ্য করে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। জীবনের কি লীলা খেলা! এই বৃদ্ধার মেয়ে এক যুগ পার হয়ে একসময় বৃদ্ধা হয় এবং জীবনের শেষে তাকেও তার মায়ের চেয়ে আরো বেশি দুঃখ যন্ত্রণা পেয়ে মরতে হয়েছে। এই তো দুই বছর আগে কয়েকজন মিলে আমরা তার জন্য প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তার কি করুণ অবস্থা! দেখে মনে হয়েছে যেন কঙ্কাল এক মৃত মানুষ শুয়ে আছে। কথা বলতে পারে না। ফ্যাল-ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে কান্না করে। এই বৃদ্ধার কান্না দেখে কেমন যেন জানার একটা কৌতুহল হলো। তার এ ধরণের কান্নার রহস্যটা কি! কয়েক দিন পর একজনের কাছে জানলাম বেচারা নাকি তার মেয়ের কাছ থেকে সেবা তো পায়ই না, খাবারও ঠিক মতো পেতো না। যার কারণে হাতের নাগালে যা পেতো তাই খেয়ে, সে না-কি এতদিন বেঁচেছিল। টিকটিকি,

তেলাপোকা, পিঁপড়া কোন কিছুই না-কি তার কাছ থেকে রেহায় পেতো না। কথা বলতে পারে না বিধায় যারা তাকে দেখতে যেতো তাদের কাছে সে তার কষ্টের কথা কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ করতো। বৃদ্ধাটি এক সময় মারা যায়। তার মৃত্যুর পর গ্রামের অনেকেই বলাবলি করতে লাগলো যে, বেচারা বুড়ি কষ্ট করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে গিয়ে ভালই হলো।

আমাদের সমাজে ইদানিং এধরণের ঘটনা না ঘটলেও প্রবীণদের নানাভাবে ভোগান্তির দৃশ্য গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-নগরে দেখতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত পরিবারে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেশি থাকে সেই পরিবারেরা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাদের নাতি-নাতনীদের সাথে আনন্দে থাকে। কিন্তু অনেক সময় এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক সঙ্কটের কারণে ছেলেমেয়েরা তাদের পিতা-মাতাকে লালন-পালনের জন্য ভাগা-ভাগি করে নেয়। আর এদিকে প্রবীণদের তখন দুঃখের পেয়ালা শুরু হয়। সারাজীবন সুখে-দুঃখে ধনে-দারিদ্র্যে এক সাথে থাকার পর জীবনের শেষে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে থাকার মাঝে তারা যে কষ্ট পাই, এ কষ্ট প্রবীণরা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। একইভাবে পরিবারে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা কম থাকলেও প্রবীণদের মধ্যে আর একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকুরীর কর্মব্যস্ততায় বা তাদের নিজেদের আরাম-আয়েশের জন্য বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তারা যত্ন নিতে পারে না। তাদেরকে রেখে আসে বৃদ্ধাশ্রমে। ছেলেমেয়েরা মনে করে তাদের প্রবীণ পিতা-মাতাদের জন্য এখন এটাই উত্তম স্থান। তারা এখানে ঠিকমতো যত্ন পাবে ও নিরাপদে থাকবে। বৃদ্ধাশ্রমে যারা থাকে তাদের সাথে গল্প-গুজপ করে সময় কাটাবে। তবে এখানে প্রশ্ন থেকেই যায়। কোন প্রবীণকে যদি বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করা হতো, সে কি সেখানে যেতে চাই কিনা। তাহলে সে নিশ্চয় এক বাক্যেই না বলে দিতো। কারণ প্রবীণরা চায় না তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়া বসতবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। বৃদ্ধাশ্রমে আরাম-আয়েশের জন্য যতই ভাল ব্যবস্থা থাকুক না কেন তারা নিজেদের আপনজনকে ছেড়ে একা থাকতে কারই বা মন চায়। প্রবীণরা আসলে ছেলেমেয়েদের কাছে বেশি কিছু চায় না। তারা শুধু চাই আপনজনেরা যেন তাদের কাছাকাছি থাকে। পরিবারে তাদের গুরুত্ব দেয়। অফিসে যাওয়ার আগে তার মেয়ে বা ছেলে যেন বলে যায়, মা-বাবা খেয়ে নিও কিন্তু। কিংবা অফিস থেকে ফিরে এসে একটুখানি যেন জিজ্ঞেস করে, মা-বাবা তুমি

খেয়েছ তো? এর চেয়ে বেশি চায় কিনা আমার জানা নেই। তাই আমার কাছে মনে হয় প্রবীণদেরকে যদি পরিবারে ঠিকমতো সেবা-যত্ন, ও সম্মান করা হয় তাহলে তারা পরিবারেই ভাল থাকবে। তবে এটাও সত্য যে, পরিবারে প্রবীণদের ভাল থাকা- না থাকা নির্ভর করে পরিবারের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনীদের ওপর। পরিবারে প্রবীণেরা কেন ভাল থাকে না এবং কিসের জন্য পরিবারে প্রবীণেরা ভালো থাকে সেগুলো নিম্নে আলোকপাত করছি:

প্রতিটি মানুষের শৈশবের জীবনটা সবচেয়ে মধুর হয়। এই সময় ছেলেমেয়েরা পরিবারের সবার কাছ থেকে আদর-স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে বেড়ে ওঠে। প্রবীণেরাও নাতি-নাতনীদের নিয়ে আনন্দে থাকতে ভালবাসে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে প্রবীণেরা নাতি-নাতীদের কাছে থেকেও তাদের কাছে পায় না। তাদের আদরের নাতি-নাতনীরা দাদা-দাদীদের গল্প-কাহিনী শোনার চেয়ে মোবাইলে গেম খেলতে, ভিডিয়ো ও কার্টুন দেখতে ভালবাসে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও প্রবীণদের সচেতন থাকতে হবে যাতে তারা মাল্টিমিডিয়ার দিকে বেশি আসক্ত না হয় এবং তারা যেন বড়দের কথা শুনে চলে। বিশেষ করে দাদা-দাদীদের গল্প-কাহিনী শুনে নৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং দাদা-দাদীদের সম্মান শ্রদ্ধা করে যেন তারা আশীর্বাদ পায়।

আজকাল আমরা দেখি কৈশরের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে এতো ব্যস্ত যে তারা তাদের দাদা-দাদীদের বা নানা-নানীদের জন্য সময় দিতে পারে না। বার্ধক্যজনিত কারণে তাদের দাদা-দাদীরা যে বিছানায় পড়ে আছে সেদিকে তাদের খেয়াল থাকে না। সারাক্ষণ তারা মোবাইল, ফেসবুক, ইউটিউব ও ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই সমস্ত যুবক-যুবতীদের উদ্দেশেই পোপ ফ্রান্সিস ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে নটর ডেম কলেজে আন্তধর্মীয় মহাযুবসমাবেশে বলেছিলেন, "তোমাদের সংস্কৃতি বড়দের সম্মান করা। তাই তোমরা বড়দের সম্মান করে চলো। মোবাইলে ব্যস্ত না থেকে পরিবারের বাবা-মা, দাদা-দাদীদের একটু সময় দাও। তাদের সাথে সরাসরি আলাপচারিতা ও দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করো।" হ্যাঁ, সত্যিই পৃথিবীর সব যুবক-যুবতীরা যদি তাদের প্রবীণ দাদা-দাদীদের একটু সময় নিয়ে সেবা-যত্ন করতো, তাহলে প্রবীণেরা অবশ্যই ভালো থাকতো। এখানে প্রত্যেক যুবাদের মনে রাখা দরকার, তোমরা তোমাদের দাদা-দাদীদের সেবা না করলে কারা করবে! তোমরা যদি এখন তাদের সেবা না কর; ভবিষ্যতে দেখবে তোমাদের সময়ও তোমাদের নাতি-নাতনীরাও তোমাদেরকে সেবা-যত্ন করবে না। যিশু বলেছিলেন, "তোমরা নিজেরা যে বিচার নীতিতে পরের বিচার করছ, তোমাদেরও একদিন সেই মতোই বিচার করা হবে। তোমরা নিজেরা এখন যে মাপকাঠিতে অন্যকে মেপে দিচ্ছ, তোমাদেরকেও একদিন সেই মাপকাঠিতেই মাপ হবে *(মথি ৭:২)*।"

যৌবনে এসে যুবক-যুবতীরা একে-অপরকে বেছে নেয়। একসময় তারা বিয়েও করে। বিয়ের পর ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়ার সাথে-সাথে যখন আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় তখন তারা তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সংসারের বোঝা মনে করে। পরিবারে কোনো সমস্যা হলে তাদের পিতা-মাতাদের দোষারোপ করে। ছেলেমেয়েদের সামনে বকা দেয়। অন্যান্য প্রবীণদের সাথে তুলনা করে তাদের হৃদয়ে কষ্ট দেয়। এমনকি অনেক সময় তারা নিজেদের পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেই, "এই বুড়ো-বুড়ি মরে না কেন? সব সময় জ্বালাতন করে।" যে ছেলেমেয়েরা এভাবে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়, তাদের কাছ থেকে সমাজ কি আশা করতে পারে। যে মা তাকে ৯ মাস ১০ দিন ধরে গর্ভে ধারণ করেছে। যে পিতা এতদিন লালন-পালন করে তাকে মানুষ করেছে সেই প্রবীণ পিতাকে এভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা মতে, "সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধ বয়সে তার অবলম্বন হও, তার জীবনকালে তাকে দুঃখ দিও না। যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাকে সহানুভূতি দেখাও। তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাকে অবজ্ঞা করো না....পিতাকে যে একা ফেলে রাখে সে ঈশ্বর-নিন্দুকের মত, মাতাকে যে ক্ষুব্ধ করে তোলে সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র।"

পরিবারের সুখ শান্তির সমৃদ্ধির জন্য প্রবীণদের অবদানও অপরিসীম। প্রবীণরা তাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতা দ্বারা পরিবারের উত্তোরত্তর উন্নতির জন্য সাহায্য করে। শুধু তাই নয় তারা বিভিন্নভাবে মণ্ডলী ও সমাজের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখছে। যা প্রশংসার দাবিদার। তবে তাদের এধরণের ভাল কাজের মাঝে কিছু খারাপ দিক লক্ষ্য করা যায় যে, অনেক প্রবীণ আছে যারা সারাদিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তাঘাটে আবোল-তাবোল কথা বলে। বৃদ্ধরা মানুষের কাছে কুৎসা রটায়। সমাজে ভাল কিছু করার চেয়ে মন্দ কিছু করার অনুপ্রেরণা দেয়। এই সমস্ত প্রবীণদের পরিবারে বা সমাজে কি কি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে সাধু পল তীতের কাছে লেখা পত্রে বলেছেন, "বৃদ্ধরা যেন মিতাচারী হয়, আত্মসংযমী হয়, যাতে তারা সকলের শ্রদ্ধার যোগ্য হয়ে ওঠে, এবং তারা যেন যথার্থ খ্রিস্টবিশ্বাস, ভালবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পথেই চলে। তেমনি বৃদ্ধাদের আচার-আচরণও যেন ভক্তজনেরই উপযুক্ত হয়; তারা যেন কুৎসা রটানোর অভ্যাস কিংবা পানদোষের দাসত্বে না পড়ে; সদুপদেশ দিয়ে তারা তরুণী বধূদের যেন স্বামী ও সন্তানদের ভালবাসতে শেখায়; আর এ-ও যেন শেখায়, কেমন করে আত্মসংযমতা, সৎ-চরিত্রা, সহৃদয়া, গৃহকর্মে নিষ্ঠাবতী ও স্বামীর প্রতি অনুগত হয়ে থাকতে হয়; এমনভাবে থাকলে ঐশবাণীর নিন্দা কেউই করতে পারবে না" *(তীত ২:২-৫)*।

চলে এসো মেঘবালিকা

খোকন কোড়ায়া

নীল আকাশের সাদা মেঘ
যাচ্ছ কোথায় উড়ে?
এই আকাশেই ফিরে এসো
পরীদের দেশ ঘুরে।
এখানে তোমার কত বন্ধু
সে খবর কি রাখো?
তুমিতো শুধু আকাশের দিকে
অবাক তাকিয়ে থাকো।
শিউলী ফুল তোমারি জন্যে
ফুটে প্রতি রাতে
তুমি আস না সেই বেদনায়
ঝরে পড়ে প্রাতে।
নদীর ধারের কাশফুলেরা
কত অশান্ত হায়
উড়ে-উড়ে তোমার কাছে
চলে যেতে চায়।
চলে এসো মেঘবালিকা
মাটির কাছাকাছি
ছোট্ট খুকি তোমার সঙ্গে
খেলবে কানামাছি॥

নবীন জীবনে প্রবীণজনেরা অনুপ্রেরণা ও সুপরামর্শদাতা

চক্রাকার মানব জীবনে বার্ধক্য এক চরম বাস্তবতার নাম। ব্যক্তিজীবনে সকলেই পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনিত হয়। জীবনের একটা সময় এসে কর্মক্ষম মানুষ অক্ষম হয়ে পড়ে, পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে পরিবারের সদস্যের উপর কিন্তু সমাজে ও পারিবারিক জীবনে বয়োজ্যেষ্ঠদের কতখানি গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ণ করা হয় সেটাই মূল বিষয়। প্রবীণেরা বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে ঠিকই কিন্তু অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা তারা তাদের পারিপার্শ্বিকতা বিচার করে। শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও তারা অভিজ্ঞতার আলোকে নবীনদের কাছে হতে পারে সঠিক পথে চলার অনুপ্রেরণা। কয়েকজন প্রবীণদের সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর **জ্যাষ্টিন গোমেজ ও জাসিন্তা আরেং**-এর কথোপকথনে উঠে এসেছে, **জীবনের শেষার্ধে এসে মানবিক জীবন-যাপনে একজন প্রবীণ আজ কতটুকু সন্তুষ্ট, ২৪ ঘণ্টা থাকা-খাওয়ার নিশ্চয়তা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে কিছু কথা। আমাদের সমাজে প্রবীণদের সামাজিকভাবে শক্তিশালী করার জন্যে তাদের বিশেষ পরামর্শসমূহ। জীবনের দুর্যোগে দিশাহীন নবীনদের নিয়ে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও আশার বাণী** নিয়েই সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর এই বিশেষ প্রতিবেদন।

ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ এই জীবনের জন্যে

সিস্টার মেরী ইম্মাকুলেট আরএনডিএম (৭৬)

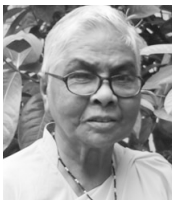

জীবনের এই পর্যায়ে এসে মানবিক জীবন-যাপনে আমি আজ বড়ই সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত। মহান সৃষ্টিকর্তা মায়ের জঠরে আমায় বুনে রেখেছেন তাঁর একান্ত সন্তান হিসাবে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি গরীব-দুঃখী ভাইবোনদের সেবা দিয়ে। আজ কৃতজ্ঞতাভরা অন্তরে তাঁকে জানাই ধন্যবাদ আমার এই সুন্দর উৎসর্গীকৃত জীবনের জন্য। এখন পর্যন্ত কোনকিছু চাওয়ার আগেই হাতের কাছে সবকিছু পেয়ে যাই। নিজেকে মানব সেবায় বিলিয়ে দিয়েছি বলে ঈশ্বরও আমায় নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদান করে যাচ্ছেন, তাতে তাঁর কোন কার্পণ্য নেই। যিশু বলেছেন, যে কর্মী, তার অন্ন-বস্ত্র পাবার অধিকার তো আছেই।

প্রবীণেরা আমাদের সমাজের পরিচালক ও পথ নির্দেশক। সামাজিক মূল্যবোধ যেমন একতা, ভালবাসা, গুরুজনদের প্রতি সম্মান, পরোপকারী ও বিনয়ী ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব ও শিক্ষা সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করবে এবং অনৈতিক কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। ধর্মীয় ভাবধারা বজায় রাখতে হবে সকলের মধ্যে। আর এভাবেই সমাজে প্রবীণদের সামাজিকভাবে শক্তিশালী করা যাবে। নবীনদের উদ্দেশে বলতে চাই, জীবনের দুর্যোগে তোমরা দিশাহীন হইও না এবং কোন দুচিন্তাও করো না। তোমাদের জীবনে এমন কোন হীনকাজ করো না যা তোমাদের ঠেলে দিবে মরণের পথে। সৃষ্টিকর্তা তোমাদের পাশে আছেন ও থাকবেন।

সবার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হোক

সিস্টার নিবেদিতা এসএমআরএ (৭৪)

জীবনের এই প্রান্তে এসে আমার মিশ্র একটি অনুভূতি অনুভব হচ্ছে। সুখে-দুঃখে সবার সাথে ভালই দিন কাটছে। যতটুকু পারি নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি। যদিও মাঝে-মাঝে একটু কষ্ট অনুভূত হয়, যখন দেখি প্রবীণদের তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। অনেকটা অবহেলাই করা হয়। সেজন্যে আমার জীবনের প্রতি মায়া-দয়া আগের মত আর নেই। যদিও জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। থাকা, খাওয়া, স্বাধীনতা ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়াদির সাপোর্ট পেয়ে যাচ্ছি যথাযথই। আমাদের সমাজে প্রবীণদের সামাজিকভাবে শক্তিশালী করার জন্যে প্রয়োজন তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া। হয়তো শারীরিকভাবে আমরা সক্ষম নই কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে স্বল্প পরিসরে হলেও সাহায্য করতে চাই। আর এক্ষেত্রে যারা গ্রহণ করবে, তাদেরও গ্রহণীয় মনোভাব থাকা দরকার। পিতা-মাতাদেরও উচিত তাদের সন্তানদের সঠিক পথনির্দেশনা দেয়া। ছোট থেকেই প্রবীণদের পাশে দাঁড়াতে ও নৈতিক শিক্ষাদান করতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার করা ও প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার বিষয়সমূহ সম্পর্কে পিতা-মাতাদের সচেতন হতে হবে। দিশাহীন নবীনদের উদ্দেশে বলতে চাই, পরিবারে বড়দের কথা শুনবে ও তাদের মান্য করো। মা-বাবা হলো আমাদের জীবনের প্রধান শিক্ষক, তাই তাদের বাধ্য থাকা নবীনদের দায়িত্ব।

সন্তানদেরই এগিয়ে আসতে হবে

টমাস ক্রুশ(৮৫)

মানবিক জীবনের এই পর্যায়ে এসে আমার জীবন নিয়ে ভালই আছি। চাকুরি জীবনে বেশ সক্রিয় ছিলাম। যদিও বর্তমানে অবসর জীবন-যাপন করছি। আর এই অবসর জীবনে প্রতিনিয়ত ভাবি গত হয়ে যাওয়া দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে। পাঁচ সন্তানের জনক হয়ে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে জীবন ভালই কাটে। যদিও মাঝে-মাঝে একাকিত্ব থাকে। তারপরও বাসায় আমার নাতি-নাতনীদের সাথে অবসর সময় আনন্দে যায়। বর্তমানে আমি আমার বড় ছেলের সাথে আছি। সেই আমার সার্বিক দেখাশোনা করে। এটা আসলে সত্যি যে আমাদের সমাজে বর্তমানে প্রবীণেরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি, সন্তানদের বিপথে যাওয়া প্রধান দায়। সন্তানদের শিখতে হবে বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করা ও প্রবীণদের পাশে থাকা। তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তারা একসময় আমাদের এই পর্যায়ে আসবে। নবীনদের উদ্দেশে বলতে চাই, তারা যেন শিক্ষা গ্রহণে অনুরাগী হয়। কেননা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

মায়া মমতা জাগ্রত করতে হবে

বেনেডিক্ট বিমান বিশ্বাস (৭৮)

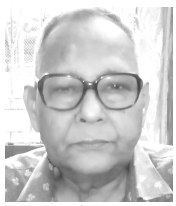

জীবনের শেষার্ধে এসে সন্তুষ্টিপূর্ণ জীবন-যাপন করছি। যদিও আমার স্ত্রী আমার পাশে নেই, তাই কিছুটা দুঃখতো আছে। তাকে এখনও অনেক অনুভব করি। তারপরও এর মাঝেও আমার দুই ছেলে ও দুই মেয়ের সাথে জীবন-যাপন ভালই অতিবাহিত হচ্ছে। নাতি-নাতনিদের সাথেই অবসর জীবন কাটে আমার। তারা আমাকে অনেক আনন্দে রাখে। আমাকে গান শোনায়, আর্ট করে দেখায়। আমার প্রতি ছেলে-মেয়েদের সম্মান ও ভালবাসা ইতিবাচক। তাদের নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। এদিক দিয়ে ঈশ্বর আমাকে আশিসধন্য করেছেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে সত্যি দুঃখ হয় যখন শুনি অন্যান্য জায়গায় প্রবীণেরা ভালভাবে যত্নাদি পায় না। অনেক অবহেলার শিকার

হয়। যা মোটেই প্রত্যাশিত নয়। যুবসমাজকে বলতে চাই, অন্যদের প্রতি আচরণ শোভনীয় করতে হবে। নিজেদের মধ্যে মায়া-মমতা জাগ্রত করতে হবে এবং সামর্থ অনুযায়ী অন্যের পাশে দাঁড়াতে হবে।

প্রবীণদের যথাযথ সম্মান দেয়া হোক

এলিজাবেথ আরেং (৮৫)

জীবনের পড়ন্তবেলায় এসে নিজেকে বোঝাসম মনে হয়। কেননা বিগত কয়েক বছর যাবত শারীরিক ও মানসিক কষ্টের মধ্যদিয়ে দিন কাটছে। স্বামী দুবছর আগে গত হওয়ার ফলে মনের মধ্যে শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তারপর আমার বড় মেয়ের হঠাৎ মৃত্যু মনে বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। পরিতাপের সাথে বলতে হয় যে, সন্তানদের মতের অমিল, অপোসহীন মনোভাব ও পরনির্ভরশীল জীবন নিয়ে আমি ততটা সন্তুষ্ট নই।

বর্তমানে আমি যেহেতু নিজে চলাফেরা করতে অক্ষম, তাই আমার ছোট মেয়েই আমার দেখাশোনা করে। সে আমার চিকিৎসা, থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় সবকিছুর দায়িত্বে আছে। আমার মেয়ে আমাকে দেখাশোনা করার তাগিদে কোথাও যাওয়া-আসা ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না। আমার সবকিছু তাকেই দিতে হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীরা কম-বেশি সকলেই অচল ও অনেকেই মারা গেছে। সারাক্ষণ ঘরেই বসে থাকা হয়, কোথাও যাবার সুযোগ হয় না। তাদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকলেও চলাফেরা না করতে পারায় কারো সাথে কথা বলা বা দেখা করার অবকাশ নেই।

আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, যে সকল প্রবীণ রয়েছে তাদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হতে হবে। যেহেতু বয়সে ও অভিজ্ঞতায় তারা বড়, তাই তাদের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন তারা কম বয়সীদের আচরণে কষ্ট না পায়। সমাজে যারা প্রবীণ রয়েছে তারা সম্পদস্বরূপ, তাই তাদের সম্মান ও মর্যাদার নজরে দেখতে হবে।

এ যুগের নবীনেরা জীবনকে অনেক সহজ চোখে দেখে। মূলত অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শীতার বড্ড অভাব। জীবন একটা ভাসমান নৌকার মত, ঝড়-বাদল আসবেই। সেসময় নৌকার হাল শক্ত করে ধরতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন অনুপ্রেরণা ও অভিজ্ঞতা, যার উৎসই হলো প্রবীণেরা। তাই প্রবীণদের যথাযথ সম্মান দেয়া হোক এটাই প্রত্যাশা।

সন্তানদের নিয়ে ভালই আছি

লেটিসিয়া পালমা (৭৮)

জীবনের এই পর্যায়ে এসে সন্তুষ্টি অনুভব করছি। আর এই সন্তুষ্টি একদিনে অর্জিত হয়নি। প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ পেয়েছি। আমার দশ সন্তানের মধ্যে তিনজনকে ঈশ্বরের রাজ্যের কাজের জন্যে উৎসর্গ করতে পেরে মনের মধ্যে একধরনের প্রশান্তি অনুভব করি। এছাড়াও আমার প্রত্যেক সন্তান যে যার অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। আর তারাই আমার সার্বিক দেখাশোনা করে। আর বর্তমানে আমি আমার ছোট মেয়ের বাসায় থাকি। আমার সব ছেলে-মেয়েরা আমার চিকিৎসা থেকে শুরু করে সব প্রয়োজনে সর্বদা সজাগ।

আমি আমাদের সমাজের প্রতিটি সন্তানকে বলতে চাই, পরিবারে যারা প্রবীণ আছেন তাদেরকে সর্বদা যত্ন নিতে হবে। যাতে তারা মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে পারে। এই ভেবে যে, তারা একা নন, তাদেরকে দেখার মত লোক আছে। তোমরা প্রবীণদের কাছে আসো আর তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোন। তাদেরও অভিজ্ঞতা আছে কিভাবে তারা দিশাহীন সময়ে কূল-কিনারা খুঁজে পেয়েছিল।

আর প্রবীণদের আহ্বান করি, আপনারা সর্বদা ঈশ্বরের পথে চলবেন এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন, দেখবেন ঈশ্বর আপনাকে শক্তি ও সাহস দিয়েছেন।

প্রবীণদের ভুলে যেও না

ফাদার আবেল বি রোজারিও (৮৩)

মূলত প্রবীণ অবস্থাটা গ্রহণ বা মেনে নেওয়া কঠিন বিষয়। তবে বিশপ হাউজে আমার থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা ও স্বাধীনতা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। এখানে আমি ভাল আছি এবং সবার সেবা-যত্নে দিন যাপন করছি। প্রবীণদের এ বয়সে মনে বল আনতে হলে, বেশি করে প্রার্থনা করতে হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, বর্তমানে সমাজে অনেক খ্রিস্টান পরিবারে প্রবীণেরা সঠিক যত্ন ও সেবা পাচ্ছে। যা দেখে মনে বেশ আনন্দ আসে। আবার অনেক পরিবারে দেখছি বুড়ো-বুড়ি বা প্রবীণদের খুব একটা যত্ন নেওয়া হয় না। এমনকি সঠিকভাবে খাওয়া ও চিকিৎসাও দেওয়া হয় না; যা সত্যিই হৃদয়বিদারক। তাছাড়া, দেশে বয়স্ক ভাতার প্রচলন রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা থেকেও বেশিরভাগ প্রবীণেরা বঞ্চিত হচ্ছে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক প্রবীণেরাই মাত্র বয়স্ক ভাতা পাচ্ছে। তবুও বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে যেন আমরা জীবনের বাকি পথ চলি এবং বিশ্বস্ত থাকি প্রবীণদের কাছে এটাই আমার আহ্বান। সকল প্রবীণদের জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

যুবাদের উদ্দেশে বলতে চাই, তোমরা এখন যৌবনদীপ্ত, গায়ে শক্তি আছে ও অসীম সাহসের অধিকারী। অনেক কাজ করতে পার; তবে ভাল কাজ করতে আগ্রহী হতে হবে। বৃদ্ধ বা প্রবীণদের ভুলে যেও না, কারণ তোমরাও একদিন প্রবীণ হবে। এই ভেবেই, তাদের প্রতি ভালবাসা দেখাতে হবে, যত্ন নিতে হবে; তাদের সময় দিতে হবে যেন তোমরাও তোমাদের জীবনের শেষার্ধে এমন সেবা পেতে পার। প্রবীণেরা সর্বদা চায় যেন তাদের সাথে আপনজনেরা আলাপ-আলোচনা করে ও তাদের সঙ্গ দেয়। ***যুব যাজকেরা, তোমরাও তোমাদের পূর্বসূরীদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, সম্মান ও সঙ্গ দিবে*** ॥

প্রৌঢ়ত্ব জীবনের স্বাভাবিক ধারা হলেও তা কঠিন বাস্তবতা। প্রবীণ বয়সে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। তখন অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধশালী হলেও শারীরিক সক্ষমতা থাকে না। তাই তো আমাদের সমাজে প্রতিনিয়তই ফুটে উঠছে প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন সমাচার। আর এই সমাচারগুলোর কোনটা ইতিবাচক আবার কোনটা নেতিবাচক। সমাজের সকল প্রবীণেরা তো আর সমান সুযোগ পাচ্ছে না। কেউ বা আছে সন্তানের যত্নের ছায়াতলে আবার কেউ অবহেলায় ঘরের এক কোণে। অনেকেরই ঠাঁই মিলেছে বৃদ্ধাশ্রমে। যা চিরাচরিত বাংলা ঐতিহ্যের সৌন্দর্য 'পারিবারিক বন্ধনের' বিপরীত সংস্কৃতি। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, প্রবীণেরা হলো জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সৈনিক, যারা জীবনের নানান চড়াই-উতরাই পার করে নিজেদের দক্ষতা ও সাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছে নিজ পরিবার এবং সমাজে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যেকোন ব্যক্তিই তরুণ-তরুণীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। কিন্তু বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের কটাক্ষ করা হচ্ছে, বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের প্রাপ্য সম্মান, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে। তাই তরুণ-তরুণী বা নতুন প্রজন্মের ওপর দায়িত্ব এসেছে প্রবীণ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে প্রবীণদের সম্মান দানের সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে। আর এমনিভাবে প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা এবং নবীনের তেজস্বীতা ও কর্মক্ষমতার সমন্বয়ে গঠিত হবে কল্যাণময় মিলনসমাজ॥

ফাদার হোমরিক গারো অঞ্চলের একজন মহান মিশনারী

বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি

ভূমিকা: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ফাদার হোমরিক ছিলেন গারো অঞ্চলের মহান মিশনারী। এদেশে তার আগমন হয় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাদেশ তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

বাংলাদেশে এসেই তিনি ঢাকা নটর ডেম কলেজে বাংলা ভাষা শেখা শুরু করেন এবং এ ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ভাষা শেখা শেষ হলে তিনি ঢাকার গোল্লা ধর্মপল্লীতে পালকীয় কাজ করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। যুবক ফাদার হোমরিক এর হলিক্রস মিশনারী হওয়ার জন্য যে উপযুক্ত গুণগুলো প্রয়োজন ছিল সে সবই তিনি জীবনে ধারণ করেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে তিনি বাংলাদেশে বিশেষভাবে গারো অঞ্চলে তার জীবনের সমস্ত বছর যিশুর কাজ করেন এবং প্রেরিত শিষ্যদের মত নিবেদিত জীবন-যাপন করেছিলেন। তিনি মূলত প্রেরিত শিষ্যদের মত পৃথিবীর প্রান্তদেশ বাংলাদেশের মান্দি অঞ্চলের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তিনি মান্দিদের জন্য যিশুর মুক্তির বাণী আজীবন ঘোষণা করে গিয়েছিলেন।

গারো অঞ্চলে ফাদার হোমরিকের আগমন

গারো অঞ্চলে ফাদার হোমরিকের আগমন ঘটে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। তিনি প্রথমত ময়মনসিংহ ধর্মপল্লীতে এবং বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীতে পালকীয় কাজ করেন। পরে আবিমা অঞ্চলে বিশেষভাবে জলছত্রে তিনি পালকীয় কাজের জন্য ময়মনসিংহ থেকে আসা-যাওয়া করতেন। তখনকার সময় জলছত্র ছিল ময়মনসিংহ ধর্মপল্লীর একটি উপকেন্দ্র এবং সেখানে অবস্থান করে আবিমা অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে যিশুর আদর্শ ও তার বাণীপ্রচারের কাজ করতেন এবং জীবনাচরণ দিয়ে খ্রিস্টাদর্শের সাক্ষ্য বহন করতেন।

ফাদার হোমরিক যে সময় আবিমা অঞ্চলে আসেন সেই সময় এ অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্য। তখন এ গহীন অরণ্যে বিষধর সাপ ও হিংস্র বন্য প্রাণী যেমন বাঘ, ভালুকও বাস করত। অরণ্যবাসী গারোদের ধর্ম ছিল সাংসারেক (সংসারেক) এবং সাংসারেক ধর্মাবলম্বী গারোরা ছিল অশিক্ষিত ও গরীব। জুমচাষ ছিল তাদের প্রধান পেশা। ফাদার হোমরিক দেখলেন তাদের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা তেমন ভাল নয়। বিশেষভাবে এ অঞ্চলে খাবার জলের সমস্যা ছিল বড় সমস্যা। অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, অশিক্ষিত, অভাবগ্রস্ত এ অঞ্চলের গারোরা ছিল সহজ-সরল। তিনি চিন্তা করলেন এত সরল-সুন্দর এ অঞ্চলের মান্দিদের ভাগ্যোন্নয়নে কিছু করা দরকার।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ফাদার হোমরিকের যুগান্তকারী পদক্ষেপ

তিনি চিন্তা করলেন এ অঞ্চলের গারোদের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। কাজেই শিক্ষাটা আগে দরকার এবং শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া দরকার। তিনি এই চিন্তা থেকে এ অঞ্চলের মান্দিদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিলেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করলেন। তিনি শিক্ষার জন্য এবং মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন এবং ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি প্রাইমারী স্কুলকে প্রথমে জুনিয়র, পরবর্তীতে কর্পোস খ্রিস্টি নামে হাই স্কুল স্থাপন করলেন। তার আগে তিনি জলছত্র উপকেন্দ্রকে কর্পোস খ্রিস্টি নামকরণ করে পূর্ণাঙ্গ ধর্মপল্লীতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং ধীরে-ধীরে খ্রিস্টের বাণীকে প্রচার ও প্রসার করেছিলেন। মূলত মান্দিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহনেরই প্রথম বড় পদক্ষেপ এবং মিশনারী হিসাবে ফাদার হোমরিকের প্রধান যুগান্তকারী কাজ। তাই মান্দিদের শিক্ষায় শিক্ষিত করাকেই তিনি প্রথম প্রাধান্য দিয়েছিলেন। শিক্ষায় অনগ্রসর আবিমা অঞ্চল তথা অন্যান্য গারো অঞ্চলের গারোদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি শুধু প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বরং তিনি সকল গারোদের কথা ভেবে জলছত্র ধর্মপল্লীতে হাই স্কুলও স্থাপন করলেন এবং পাশাপাশি ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থাও করলেন, যাতে দূরের গারো ছাত্র-ছাত্রীরা হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে এবং পাশাপাশি খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণও লাভ করে। কর্পোস খ্রিস্টি হাই স্কুল স্থাপনের ফলে শুধু যে অত্র অঞ্চলের গারোরাই লাভবান হয়েছে তা নয় বরং অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী যেমন হিন্দু, মুসলিম, মান্দি-তারাও সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে এবং যা বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি পীরগাছা সেন্ট পল'স ধর্মপল্লী ও একই নামে এ ধর্মপল্লীতে হাই স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেও তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের অন্যতম প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল মান্দিরা যেন যিশুর বাণী বুঝতে পারে এবং জীবন-যাপনে তা প্রকাশ করতে পারে। পাশাপাশি তারা যেন অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে আলোয় বেড়িয়ে এসে নিজেদের মর্যাদা, অধিকার, সম্পর্কে জানতে পারে, বুঝতে পারে এবং আত্মনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত হতে পারে। এজন্য ফাদার হোমরিককে বলা যায় গারোদের আলোকবর্তিকা ও জীবনের পথ প্রদর্শক, শিক্ষাদাতা জ্ঞানী পরিচালক ও প্রকৃত মেষপালক।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবদান

আবিমা অঞ্চলে ফাদার হোমরিক শিক্ষার সাথে-সাথে যে জিনিসিটি আশু প্রয়োজন হিসাবে অভিজ্ঞতা করেছিলেন তা হল তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন ও চিকিৎসা সেবা। কারণ তখনকার দিনে গারোদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা খুবই কম ছিল। বিশুদ্ধ খাবার পানীয়ের কথা তারা জানত না। তারা কুয়োর পানি পান করত। যেখানে বাইরের রোগ জীবাণু বহনকারী ব্যাঙ ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ও পড়ে থাকত। ফাদার হোমরিক দেখলেন সেই কুয়োর ময়লা-রোগ জীবাণুযুক্ত পানিই তারা খাবার-পানীয় ও রান্না-বান্নার কাজে ব্যবহার করছে। তখন তিনি গারোদের জন্য সুপেয় পানীর ব্যবস্থা করলেন এবং বিনামূল্যে টিউবওয়েল এবং রোয়ার পাম্প স্থাপন করে দিলেন। পরে তিনি সেনিটারী টয়লেটের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি স্বাস্থ্যসেবার জন্য ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষেরা চিকিৎসাসেবা নিতে পারবে। স্বল্পমূল্যে ভাল ঔষধ কিনতে পারবে, চিকিৎসাও করতে পারবে। তিনি প্রথমে জলছত্র ধর্মপল্লীতে এবং পরবর্তী সময়ে পীরগাছা ধর্মপল্লীতেও ডিসপেন্সারী স্থাপন করে গেছেন। ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, আমাশয়, টাইফয়েট, যক্ষা, কুষ্ঠ, চর্মরোগ ইত্যাদির চিকিৎসা তখন অত্র এলাকায় ছিল না; ফাদার হোমরিক এ সমস্ত মরণব্যাধির সুচিকিৎসার

ব্যবস্থা করলেন। তারপর (Foolish Virgins) অর্থাৎ যারা অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভবতী হয়ে মা হতে চাইত না তাদের জন্য বিশেষ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। মুসলিম, হিন্দু ও মান্দি সবার জন্যই তিনি মিশনে আশ্রয় দিতেন এবং গ্রামে-গ্রামে ধাত্রী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান

আবিমা অঞ্চলে তথা মান্দি অঞ্চলের কৃষিকাজ বা চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল সেকেলের। তারা বছরে একবার মাত্র কৃষি ফসল উৎপাদন করত। জুমচাষ ছিল প্রধান আর নামা ধানী জমিতে লাঙ্গলের চাষই ছিল প্রধান অবলম্বন। তিনি এ অঞ্চলের জন্য আধুনিক কৃষিচাষ পদ্ধতির ব্যাবহার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি শান্তি নিকেতনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গারো কৃষকদের এনে কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন, যার ফলে গারো কৃষকরা আধুনিক কৃষি চাষাবাদ পদ্ধতির সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয়ে ওঠে। এভাবে ফাদার হোমরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখার পাশাপাশি গারোদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকেও ত্বরান্বিত করেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গারোরা তাদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ধাপে -ধাপে সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তিনি আরোও যে সব কাজটি করেন তা হল:

১। তিনি মান্দি ধানের উন্নতমানের বীজ বিতরণ করতেন এবং জুমচাষে ফলন বৃদ্ধির জন্য তিনি উন্নত বীজ সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলো- গ্রামে-গ্রামে বিতরণ করতেন।

২। স্বাধীনতা লাভ করার পরপরই- বাংলাদেশে দুর্দশা-দুর্দিন, অভাব-অনটন চরমভাবে নেমে আসে। তখন বিদেশ হতে প্রচুর খাদ্য আমদানি করা হয়। সরকার এবং (NGO) বিশেষত (CORR) বর্তমান কারিতাস প্রচুর খাবার পরিবেশন করে। এই বিপর্যয়ের সময় ফাদার হোমরিকের নেতৃত্বে গ্রামে-গ্রামে খাবার বিতরণের ব্যবস্থা হয়।

৩। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত চাষাবাদের জন্য প্রচুর ট্রাক্টর প্রদান করে। এ সময় অনেক জাপানিরা বাংলাদেশে এসে ট্রাক্টর দ্বারা চাষাবাদ করতে প্রশিক্ষণ দেয়। এভাবে ফাদার হোমরিক মান্দিদের আদিপ্রথা চাষাবাদ পদ্ধতির পরির্বতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করতে শিক্ষা দেন। জাপানিরাই প্রাথমিক পর্যায়ে মান্দিদের ট্রাক্টর চালাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কিন্তু ৩-৬ মাস পর জাপানিরা নিজ দেশে চলে যায়। ফাদার হোমরিক তাঁর দূরদর্শী এবং মান্দিদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য মি. আলেকজান্ডার রাবানলকে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ থেকে জলছত্র মিশনে আনয়ন করেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন কৃষিবিদ। মি: আলেকজান্ডার রাবানলের মাধ্যমে জলছত্র আবিমায় আধুনিক চাষাবাদ ইরিগেশনের বিপ্লব আনয়ন করা হয়। মি: আলেক্জান্ডার বর্তমানে পবিত্র ক্রুশ সংঘের একজন যাজক। তার যাজক হবার পিছনেও ফাদার হোমরিকের অবদান রয়েছে।

৪। স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা: দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে কোন কর্মসংস্থান ছিল না তখন ফাদার হোমরিক কর্মসংস্থানের জন্য তাঁত শিল্প স্থাপন করেন। তাঁত শিল্পের মাধ্যমে শত-শত নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই সময় তিনি মহিলাদের জন্য শিখা-সমিতি স্থাপন করেন। সে সমিতির মাধ্যমে শত-শত মহিলা শিখা-ব্যাগ তৈরি করে সংসারের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নে সক্ষম হয়েছে।

৫। ফাদার হোমরিক ক্রেডিট ইউনিয়ন স্থাপনের জন্য অনেক লোকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তিনি প্রত্যেক গ্রাম থেকে মাতব্বর ও স্বল্প শিক্ষিত লোকদের জন্য এই প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান প্রদান করেন।

কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষায় ফাদার হোমরিকের অবদান

যে কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তার ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিলুপ্তির অর্থই হল পৃথিবী থেকে একটি জাতির অস্তিত্ব চিরতরে হারিয়ে যাওয়া। ফাদার হোমরিক এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি গারোদের জন্য খ্রিস্টীয় বিশ্বাস প্রদানের পাশাপাশি তাদের ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষায় সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গারোদের ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতার মাধুর্যে এতোটাই বিমুগ্ধ ছিলেন যে তাদের ভাষার সৌন্দর্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও তাদের নৈতিকতার সৌন্দর্যের সব সময় প্রশংসা করতেন এবং তা চর্চা করে যাওয়ার জন্য সবসময় উৎসাহ দিতেন। শুধু তাই নয়, গারো ভাষা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য তাদের নাচ-গান, সেরেনজিং, আজিয়া, গোরি-রোয়া পরিবেশনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা করে দিতেন, মূলত এ বিষয়গুলো চর্চার মাধ্যমে তাদের ভাষা, সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি নিরলস কাজ করে যেতেন। তার প্রচেষ্টায় গারোদের বিলুপ্তপ্রায় সবচেয়ে ভাবগাম্ভীর্য গৌরবময় ও গারো ঐতিহ্যের প্রতীক ওয়ানগালা অনুষ্ঠানকে পুনর্জ্জীবিত করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে এ ওয়ানগালা অনুষ্ঠান বর্তমান পর্যায়ে এসে গারো সমাজে ব্যাপকভাবে চর্চিত হচ্ছে ও তা আরোও ভাবগাম্ভীর্যময়রূপ লাভ করে চলছে।

গারো সংস্কৃতি রক্ষায় ফাদার হোমরিক আরও একধাপ এগিয়ে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন তা হল:

১। তিনি মান্দি ভাষা চর্চা ও রক্ষার জন্য খ্রিস্টযাগে মান্দি ভাষা ব্যবহার আরম্ভ করেন। তারপর (গারো) মান্দি বাইবেল ইণ্ডিয়া-মেঘালয় থেকে আনয়ন করে খ্রিস্টযাগে তা ব্যবহার করেন। তিনি ব্রিংনি বিবাল নামে আচিক গানের বই ছাপিয়ে মান্দি ধর্মপল্লীগুলোতে বিতরণ করেন। তিনি ফাদার পিটার রেমাকে মান্দি কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহিত ও অনুপ্রেরণার দানের মাধ্যমে এই বিষয়ে একটি বিপ্লব আনয়ন করতে সক্ষম হন।

২। ফাদার হোমরিক সিএসসি মান্দিদের উপর প্রচুর বই সংগ্রহ করে অনেককে তা উপহার হিসেবে প্রদান করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন সুভাষ জেংচাম। উনার উৎসাহ উদ্দীপনা এবং অনুপ্রেরণায় সুভাষ-মান্দিদের প্রথা ও মূল্যবোধের ওপর বেশ কিছু (পুস্তক) লিখেছেন।

৩। মান্দিদের সংস্কৃতি/কৃষ্টির অন্যতম ব্যবহার্য বিষয়গুলো-যেমন নাচ-গানের বাদ্যযন্ত্র: রাং, দামা, আদুরু, বাংশি, নাগ্রা এবং যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে মিল্লাম-স্ফী, জাত্তা বা বর্সা; পোশাক-আশাকের মধ্যে যেমন দকমান্দা/দকশারি, খুতুপ ইত্যাদি; অলংকারের মধ্যে যেমন: রূপোর চুরি, থাংকাসরা, জাস্রাং। পানীয় ব্যবহারে এবং তৈরীর তৈজসপত্র যেমন দিক্খা, জাস্তি, ফং এসব তিনি সংরক্ষণ করেছেন যা পীরগাছা মিশনে সংরক্ষণে আছে এবং অন্যদেরকেও তা সংরক্ষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন।

গারো মূল্যবোধ চর্চায় বিশেষ উৎসাহ

ফাদার হোমরিক গারোদের এমনভাবে আপন করে নিয়েছিলেন যে, আবিমার মাটিতে তিনি মরতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত তা হয়ে ওঠেনি। তিনি আমেরিকান নাগরিক হলেও তার মন-আত্মায় ছিলেন গারোদেরই একজন। সেটি তিনি দেখিয়েছেন গারোদের সাথে দীর্ঘ ৬১ বছর-কাল অতিবাহিত করে এবং গারোদের 'নকরেক' চাচ্চি গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে। গারো অঞ্চলে এসে গারোদের মধ্যে তিনি প্রথম যে বিষয়টি আবিষ্কার করেন তা হল তাদের নৈতিক মূল্যবোধ। তারা সহজ-

সরল, মিথ্যা কথা বলে না, চালাকি করে না, চুরি করে না, মিলে-মিশে থাকে, মিলে-মিশে কাজ করে, মিলে-মিশে খায়, নাচ-গান করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, বয়স অনুসারে সম্মান, শ্রদ্ধা করে, স্নেহ করে। বড়দের নাম ধরে ডাকে না ইত্যাদি। মনে হয় গারোদের প্রতি তার আকৃষ্ট ও মনোযোগের প্রধান কারণই ছিল এই সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধগুলি এবং তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সৌন্দর্য যা দেখে তিনি শুধু নন, অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মানুষকেও আকৃষ্ট করে। তিনি গারোদের নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে তাদের অমূল্য সম্পদ হিসেবে দেখতেন যা তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় ও সহভাগিতায় ব্যক্ত করতেন। গারোদের মধ্যে আদি থেকে এখন পর্যন্ত যে প্রবাদ বাক্য বা মূল্যবোধের বাক্য ব্যাপকভাবে প্রচলিত তা হল- "আসি নামজা বা আসি মালজা"। ফাদার হোমরিক ব্যক্তিত্বে ছিলেন দৃঢ়, কিন্তু অসহায়, দুঃখ পিড়ীত সমস্যাগ্রস্ত মানুষদের প্রতি ছিলেন দয়াবান, উদার হৃদয় প্রকৃতির। একবার এক গারো নেতা দোষ করেছিলেন এবং অন্যায়কে সমর্থন করেছিলেন। ফাদার হোমরিক তাকে শাসন এবং সংশোধন করতে উদ্যোগ নিলে হিতে বিপরীত হয়। এই গারো নেতা ফাদার হোমরিকের সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অবশেষে অমিমাংসিতভাবে বাকযুদ্ধ সমাপ্ত হয়। প্রকৃতির কি লীলা-খেলা, কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই গারো নেতার বাড়িতে আগুন লাগে এবং সবকিছু পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। এই গারো নেতার পরিবার ঘরশুন্য হয়ে পড়ে। এই পরিবারের এই দুর্যোগ এবং দুর্দিনে ফাদার হোমরিক মিশনের কর্মচারীর মাধ্যমে মিশন থেকে খুটি এবং টিন পাঠিয়ে তাৎক্ষণিক ঘর নির্মাণ করে দেন। মান্দিদের দুর্দিনে ও দুর্যোগ মুহূর্তে ফাদার হোমরিক ছুটে যেতেন এবং তাদের রক্ষা করতেন। এই সমস্ত কিছু তিনি করেছেন মান্দিদের প্রতি তার গভীর স্নেহ-যত্ন এবং ভালবাসা থেকেই। একবার এক স্কুল বালক খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফাদার হোমরিক বিষয়টি জানার সাথে-সাথে সেখানে ছুটে গেলেন। তিনি সেই বালককে কোলে করে মিশনে আনেন এবং সে বালকের চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা করেন। সে বালক হয়তো মরে যেতে পারত কিন্তু বেঁচে গিয়েছিলেন। এই বালক লেখাপড়া করে বর্তমানে সমাজ ও মণ্ডলীর সেবা করে যাচ্ছে। গারোদের প্রতি তার উদার মনোভাবের কথা বলে শেষ করা যাবে না। কারণ তার ব্যক্তিক জীবনের মূল্যবোধ; যেমন, তিনি ছিলেন সাধারণ, সাধারণ মানুষের কাছে সহজতা, উদার-হৃদয় প্রকৃতির যা গারোদের মূল্যবোধের সাথে মিলে যায়। গারোদের তিনি পিতৃসূলভ হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসতেন। মান্দিদের জন্য তার ভালবাসা সত্যিই ছিল অতুলনীয় যা এই ক্ষুদ্র লেখায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

গারো জাতির সুরক্ষায় এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

গারো জাতির সুরক্ষার জন্য তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন একথা আমি আগেই বলেছি। কিন্তু গারো জাতিকে, বিশেষভাবে আবিমা অঞ্চলের গারো জাতিকে রক্ষার জন্য তিনি যে আরও স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে থাকবেন তা না বললেই নয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন গারো নেতাদের গুলি করে মারার জন্য লাইন করে পাকিস্তানি আর্মিরা প্রস্তুত নেয় তখন তিনি সেখানে তড়িৎ গতিতে উপস্থিত হয়ে বলেন- "তাদেরকে মারার আগে আমাকে আগে মেরে ফেল, আর আগামীকালই তা সারাবিশ্বের খবরের শিরোনাম হবে।" একথা বলার পরে পাকিস্তান সেনারা গারো নেতাদের ছেড়ে দেয় এবং গারোরা এখানে ঐতিহাসিক সুরক্ষা লাভ করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে শুধু গারোদেরই তিনি যে রক্ষা করেছেন এমন নয়, আশে-পাশে এবং অত্র এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজার-হাজার লোক তার আশ্রয় লাভ করেছিল এবং পাকিস্তান আগ্রাসী সেনাদের কাছ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

স্বাধীনতার যুদ্ধের আগে ও পরে ফাদার হোমরিককে বহুবার বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিলেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার, তবুও তিনি গারোদের কথা ভেবে আবিমা অঞ্চলেই থেকে গিয়েছিলেন দীর্ঘ ৬১ বছর। স্বাধীনতার পর এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত আবিমা অঞ্চলের গারোরা নানাভাবে নির্যাতনের, নিস্পেষণের, অবহেলার, জীবন নাশের হুমকীর মধ্যে বাস করে আসছে। বিশেষভাবে আবিমা অঞ্চলের গারোদের ভূমি দখল করে ইকোপার্ক নির্মাণের পায়তারা করে আসছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। অত্র অঞ্চলের মান্দি, গারো আদিবাসীদের বন উজারের নানা মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। জেল জুলুম করা হয়েছে, এমনকি ছলেশ রিছিল, পীরেন স্নাল ও গিদীতা রেমার মত গারো নেতা-নেত্রীদের মেরে ফেলা হয়েছে। ফাদার হোমরিক সব সময় ঐসব অমানবিক মানবতা লঙ্ঘন ও ক্ষমতাশালীদের বিমাতাসূলভ আচরণের হয়েছেন প্রতিবাদী, উদাত্ত কণ্ঠস্বর। আবিমা অঞ্চলে পাকিস্তান সরকার যখন মধুপুর গড়কে National Park ঘোষণা করে। এই ঘোষণার মাধ্যমে-মধুপুর গড় হতে আবিমার মান্দিদের উচ্ছেদের এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয় তখন পাকিস্তান সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্যে ফাদার হোমরিক প্যারিশ বোর্ড (Parish Board) নামে ২রা মার্চ-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে একটি সংগঠন গঠন করেন, বর্তমানে এটি সবার নিকট জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ নামে পরিচিত। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন প্রয়াত মি. পরেশ মৃ, সেক্রেটারী প্রয়াত মি. মার্শেল রোজারিও, প্রয়াত মি. বিনয় রেমা সদস্য এবং মি. উপেন্দ্র জেংছাম (সদস্য)। এই সংগঠনের মাধ্যমে ফাদার হোমরিক- মান্দিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পরও আবিমার মান্দিদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন, মিথ্যা বন মামলা ভূমি দখল উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র নেমে আসে ফাদার হোমরিক- এই সংগঠনের মাধ্যমে তা প্রতিবাদ করেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে, United Nations'র নিকট সংবাদগুলো পৌঁছে দেন। যে সমস্ত সংস্থা বিশেষত বিশ্ব ব্যাংক বাস্তবায়নে অর্থায়ন করত-ফাদার হোমরিক ঐ অর্থায়ন বন্ধ করতে চিঠি লিখেন।

খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার

গারো অঞ্চলে মিশনারী হিসেবে তার প্রধান শক্তি ও প্রেরণার উৎসই ছিল খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ। গারোদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎকর্ষের কথাই বলি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নিরলস কাজের কথায় বলি, সমস্ত কাজের পেছনে ছিল খ্রিস্টের আদর্শ প্রচার, তাঁর সাক্ষ্য বহন ও তাঁর মুক্তির দ্বার গারোদের জন্য উন্মোচিত করা। তার শিক্ষা কাজ ও আদর্শ মূলত ছিল মঙ্গলসমাচার ভিত্তিক। খ্রিস্টের বাণীর মমার্থ প্রচার ও তাঁর মুক্তির আহ্বানকে গারোদের জন্য হৃদয়ঙ্গম করার নিমিত্তেই তিনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে ও মনোযোগ দিয়েছিলেন। এ জন্যই ফাদার হোমরিককে গারোদের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ও অনুকরণীয় আইকন (ICON) বলা হলেও মোটেও অত্যুক্তি হবে না। ফাদার হোমরিক আবিমার মান্দি তথা সমগ্র মান্দিদের নিকট যে কারণে একজন আইকন হয়ে আজীবন বেঁচে থাকবেন তা হল: ১। যেখানে মান্দিরা শিক্ষার জ্ঞানালোক হতে বহু দূরে ছিল তিনি সেখানে জ্ঞানপ্রদীপ হয়ে মান্দিদের আলোকিত করলেন।

২। যখন মান্দিরা নিজ ভূমি-জায়গায় ঘর-বাড়ি থাকা সত্ত্বেও অন্যায়-অত্যাচার শোষণ

নির্যাতন ও উচ্ছেদ ও অনবরত বন মামলার শিকার তখন ফাদার হোমরিক সত্য-ন্যায় ও মানবাধিকারের প্রতীক হয়ে সেখানে আর্বিভূত হন।

৩। মান্দিরা যখন অসুস্থ-চিকিৎসাহীন দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত, খাদ্যাভাব ও অন্যান্য সমস্যায় পর্যবসিত হয়ে হতাশা-নিরাশায় জীবন নাভিশ্বাস তখন তিনি চিকিৎসক হিসেবে, খাদ্য-বস্ত্রদাতা হিসেবে আশার আলো হয়ে পাশে দাঁড়ান।

৪। ফাদার হোমরিক মান্দিদের নিয়ে বিরামহীন স্বপ্ন দেখতেন এবং তাদেরকে স্বপ্ন দেখতে শেখাতেন (He was a dreamer, taught to dream); এক কথায় বলা যায় যে, তিনি অনুকরণীয়, অনুসরণীয় একজন আইকন (He is an icon of Garo)।

উপসংহার

আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ফাদার হোমরিক ছিলেন প্রকৃতপক্ষেই একজন আদর্শ মিশনারী খ্রিস্টের আনুগত্য সেবক। একজন যাজক ও মিশনারী হিসাবে ফাদার হোমরিক যে কাজ মান্দি অঞ্চলে করেছেন তা মথি ২৫: ৩৫-৩৬ ও ৪০ পদের সাথে মিলে যায় যেখানে লেখা আছে-

"আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে; বিদেশী ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছে, তা আমারই জন্যে করেছ।"

গারোদেশে তার আগমন যেমন গারোদের জন্য খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী পথকে সুগম করে তুলেছে তেমনি তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি, ভূমির অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার, সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনকেও ত্বরান্বিত করেছে। যাজক হিসেবে ফাদার হোমরিক একজন প্রকৃত বাণী প্রচারক ও খ্রিস্টবিশ্বাস প্রদানকারী, স্বপ্নদ্রষ্টা, অসীম সাহসী খ্রিস্টীয় নেতা, গারোদের জন্য অন্ধকারে আলো, পথ প্রদর্শক, প্রকৃত শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মী প্রেরণাদায়ী অভিভাবক। এজন্যই তিনি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের পাশাপাশি প্রায় গ্রামে-গ্রামে প্রার্থনা গৃহ (Chapel) নির্মাণ করেছিলেন। যেখান থেকে সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ শিক্ষার পাশাপাশি গভীর আধ্যাত্মিকতাও লাভ করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক যত্নের দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে তিনি তার সহকারী পুরোহিতদের প্রায় সব সময়ই গ্রামে পাঠাতেন। গ্রামের চ্যাপেলে খ্রিস্টযাগের ব্যাপারে তিনি বিশেষ জোর দিতেন। এভাবে মানুষের সাথে আধ্যাত্মিক ও আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। পরিশেষে বলতে হয়, তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তা, ধ্যান ও দর্শন গারোদের জন্য আজীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে যা তাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিকভাবে সামনে এগিয়ে যাবার পথে শক্তি ও সাহস যোগাবে, চেতনা দান করবে প্রতিনিয়ত।

ফাদার হোমরিক এর আদর্শ গারোদের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে প্রেরণা দান করুক। তার কথা ও কাজ, শিক্ষা ও তার অকৃত্রিম ভালবাসা, আত্মত্যাগ, উৎসর্গীকৃত জীবন গারো আদিবাসীদের জন্য চেতনার সূর্য হয়ে প্রতিদিন আলো দান করুক॥

রাজশাহী ডাইয়োসিসে বার্ষিক ...

২০ পৃষ্ঠার পর

মতামত তুলে ধরেন। অনেকেই মনে করেন- ধর্মকে জীবনে উপযুক্তভাবে ধারণ করতে হলে তাকে শুরুতেই একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক হতে হবে। তার দায়িত্ব নিজের জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীর মধ্যে বিস্তৃত। সবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রেরণ বিবৃতি তৈরি করা হয়।

প্রেরণ বিবৃতি : এই বছরের পালকীয় কর্মশালার মূলসুর নেওয়া হয় "আমরা হলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক"। এই কর্মশালার মধ্যদিয়ে আমরা পরিবার, সমাজ ও মণ্ডলীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক (Stewardship) হওয়ার ক্ষেত্রে যিশু ও মণ্ডলির শিক্ষায় আলোকিত হয়েছি। দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়: দায়িত্বশীল আচরণ, দায়বদ্ধতা, ঐশ অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা, সৃষ্টির যত্ন ও পরিবেশ রক্ষা, ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছি। সেবার ঐশতাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে দায়িত্বশীল সেবক হিসেবে সময় (Time), সামর্থ (Talent) ও সম্পদ (Treasure) এর যথাযথ ব্যবহারে আমাদের বুদ্ধিমত্তা (Intelligence), সেবাকাজ ও প্রেম-ভালোবাসাকে (Heart) সম্পৃক্ত ও একাত্ম করার মাধ্যমে সেবাকাজে সফলতা আনয়ন সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। ভিকারিয়া পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তিনটি কর্মশালার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এবং ধর্মপ্রদেশীয় পর্যায়ে কর্মশালার দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন উপস্থাপনার ভিত্তিতে যেসব দর্শন (Vision), প্রেরণ (Mission) এবং অগ্রাধিকারসমূহ (Priorities) নির্ধারণ করা হয়, সেসব নিম্নে উল্লেখ করা হল। দর্শন (Vision) মণ্ডলীতে দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য সেবক হওয়া। প্রেরণ (Mission) দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য সেবক হয়ে ওঠার জন্য খ্রিস্টীয় গঠন এবং ঈশ্বর, বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের সেবার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

অগ্রাধিকারসমূহ (Priorities)

১। ব্যক্তি ও খ্রিস্টীয় পরিবার পর্যায়ে বিশ্বস্ততা, দায়িত্বশীলতা এবং দায়বদ্ধতা সম্পর্কে শিক্ষা ও ধারণা দান করা।

২। ধর্ম-কর্মে, সম্পর্কে, কথায় ও কাজে, জীবনসাক্ষ্যদানে দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত থাকা।

৩। মণ্ডলী ও সমাজের কল্যাণে সবার অংশগ্রহণে সমন্বিত পালকীয় যত্ন নেওয়া।

৪। বিশ্বপ্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন, রক্ষা ও সংরক্ষণে ব্যক্তি, পরিবার ও মণ্ডলী পর্যায়ে সচেতনতা দান ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও উপকরণের সঠিক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সম্পর্কে দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষাদান করা।

৬। দয়ার কাজ এবং স্থানীয় মণ্ডলীকে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে সামর্থ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৭। যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণ ও দায়িত্বশীল সেবক হয়ে ওঠার জন্য পর্যায়ক্রমে গঠন, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দান করা।

সবশেষে, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, পালকীয় কর্মশালায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সেইসাথে কর্মশালায় গৃহীত অগ্রাধিকারসমূহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ধর্মপল্লী ও ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করতে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান। বিশপ প্রার্থনা ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, "তার আশা, এই কাজে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরও আমাদের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ দান করবেন।"

আইন, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও জগৎ বাস্তবতায় অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুত/শরণার্থী প্রসঙ্গ

এডভোকেট ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি

পূর্ব প্রকাশের পর

খ. প্রয়োজনীয় সেবা করা (Serve): দয়ালু শমরীয়ের মত আমাদেরকে এই মানুষগুলোর কাছে যেতে হবে, তাদের অবস্থা বুঝতে হবে এবং তাদের বেদনাদায়ক পরিস্থিতি লাঘবের জন্য সামর্থ অনুযায়ী সেবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে *(লুক:১০:৩৩-৩৪)*। ভয়, কুসংস্কার, পাছে লোকে কিছু বলে ইত্যাদি নানা কারণে অনেক সময় আমরা এই অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রাপ্য সেবাদান থেকে দূরে থাকি আর আমরা তাদের প্রকৃত প্রতিবেশি হয়ে ওঠার সুযোগ নষ্ট করি। খ্রিস্টের শিক্ষানুসারে প্রকৃত প্রতিবেশি ভয় কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে রেখে, যিশু যেমন *(যোহন:৩১:১-১৫)* নিজের গায়ের আলখাল্লা খুলে রেখে, হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হাত ময়লা করে তাদের পা ধুয়ে দিলেন। আমাদের ঠিক তেমনিভাবে তাদের পাশে যেতে হবে, নিজেদের সীমাবদ্ধতাকে জয় করে তাদের মানবীয় মর্যাদা ও সকল অধিকার সুরক্ষা ও নিশ্চায়নের জন্য বাস্তবমুখী সেবাদানে নিরত হয়ে প্রকৃত প্রতিবেশি হয়ে উঠতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত আইনসমূহ বাস্তবায়নে চাপ সৃষ্টি, ঐ সকল আইনের বিরুদ্ধে ঘটিত অপরাধের বিচার দ্রুততর সময়ের মধ্যে শেষ করা, তাদের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান অথবা তারা যেখানে অভিবাসী বা শরণার্থী সেখানে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক আইনানুসারে মানবিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমেও তাদের সেবাদানে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

গ. পুনর্মিলনের জন্য তাদের কথা শোনা (Listen): তাদের বাস্তবিক অবস্থা বুঝা ও সেবা করার পাশাপাশি গুরুত্বর্পূণ বিষয় হলো ক্ষতময় কথাগুলো কান দিয়ে ও হৃদয় দিয়ে শোনা। সমস্যাগুলো সমাধান করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের শুনতে হবে। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছেন যেন তিনি জগতের কথা পুত্রের মাধ্যমে নিজ কানে শুনতে পারেন। ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর মাধ্যমে জগতকে তিনি রক্ষা করতে পারেন *(যোহন ৩:১৬-১৭)*। বিনয়ী ও মনোযোগী শ্রবণের মাধ্যমে আমরা তাদের আরো কাছে যেতে পারে ও সত্যিকারের সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারে। এই শ্রবণ আমাদের সেই প্রতিবেশিদের সাথে মিলন করিয়ে দেয় যাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে। যারা বিতাড়িত বা উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতিতে চলে আসা মানুষ তাদের হৃদয়ের কথা কয়জন শুনতে চায়, কয়জনই বা হৃদয়ঙ্গম করেন? এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম বিধায় এজগতে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তারা যেমন রয়ে গেছে অবহেলিত ও ভাসমান, তাদের সমস্যাগুলোও রয়ে গেছে ভাসমান।

ঘ. বাড়িয়ে তোলা (Grow): অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের সমাজের অপরাপর মানুষের মতই বেড়ে ওঠতে বা গঠিত হতে সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত আবশ্যক আর তার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো নিজ-নিজ সামর্থ অনুযায়ী 'সহভাগিতা' করা। আদি মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বড় শক্তি ছিল তাদের এক হৃদয় ও এক আত্মার শক্তি, তারা কোন কিছুই নিজের বলে দাবী করেনি, সবকিছুই পরস্পরের মধ্যে সহভাগিতা করতেন *(প্রেরিত: ৪:৩২)*। একসাথে বেড়ে উঠতে হলে অবশ্যই সহভাগিতার অভ্যাস করতে হয় এবং তাতেই সমস্যাগ্রস্ত শ্রেণিটি ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এবং এজগতের এই জটিল সমস্যাটি দ্রুততার সাথে সমাধানের দিকে এগুবে। পরিমাণগতভাবে অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের বিশাল সংখ্যা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই, যিশু খ্রিস্ট মাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুধা নিবারণ করার পরেও আরো অবশিষ্ট ছিল। সহভাগিতা আশ্চর্য কাজ ঘটাতেই পারে।

ঙ. উন্নয়নের জন্য তাদের সম্পৃক্তকরণ (Involve): তাদের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য এবং সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধানের জন্য তাদেরকেই বাদ দিয়ে শুধু তাদের অবস্থা বুঝা, সাহায্য দান, সেবাদান যথেষ্ট নয়, তাদেরকেও জড়িত করতে হবে যেন নিজেরা সম্পৃক্ত হয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। খ্রিস্ট নিজে ঐ নারীর কাছে আসেন, তার হৃদয়ের কথা শোনেন, অবশেষে তাকে সত্যের পথে নিয়ে গিয়ে তাকেই মঙ্গলবাণীর দূত করে প্রেরণ করেন; শেষে সে-ই অন্যদের কাছে যিশুকে পরিচয় করিয়ে দেয় নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে, 'আসুন, দেখুন একজন মানুষকে, যিনি আমার জীবনের ঘটে যাওয়া সবকিছু বলে দিয়েছেন, তিনি খ্রিস্ট নন তো' *(যোহন:৪:১-৩০)*? এমনিভাবে আমাদেরও উচিত হবে তাদেরকে উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করে এমন অভিজ্ঞতা দান করা যা তারাই মঙ্গলবার্তা হিসেবে অন্যের কাছে সাক্ষ্য বহন করবে। তিনবেলা খাবার দান, সময়মত কাপড়-চোপড় দেয়া, স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী (জেলখানা সম) আশ্রয় স্থাপন করে দেয়া, খেয়াল-খুশিমত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া, নামেমাত্র শিক্ষাদান নামক লোক দেখানো ব্যবস্থাপনা করা এই এনজিও ধরণের সেবাদান অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের পেটে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখবে কিন্তু স্থায়ী কোন সমাধান হবে না।

চ. গঠনে সহায়তা (Build): পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন তাদেরকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে, আর গঠনের জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা। সাধু পল করিন্থ মণ্ডলীর কাছে আবেদন করে বলেন, "আমি তোমাদের আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের নামে আবেদন করছি যে, তোমরা সকলে একমত হও এবং তোমাদের মধ্যে যেন কোন মতানৈক্য না থাকে, কিন্তু একই মনোভাব ও বিচার-বুদ্ধিতে ঐক্যবদ্ধ হও *(১ম করি: ১: ১০)*।" এই জগতে ঐশরাজ্য গড়ে তোলা সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্য একটি কর্তব্য; এই কারণে হিংসা, বিভেদ এবং বিচ্ছেদের মনোভাব জয় করে অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের সাথে সহভাগিতা-সহযোগিতা করতে হয়। এই বড় সংখ্যক মানুষদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দিতে হলে তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা সহকারে সর্বসাধারণের মত করেই গড়ে তুলতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি হচ্ছে, যেখানে তারা অবস্থান নিয়েছে বা আশ্রয় পেয়েছে সেখানকার অভিবাসন আইনে তাদের মূল ধারায় ফিরিয়ে এনে নাগরিক অধিকার কিংবা মানবিক অধিকার নিশ্চায়ন করলে তারা নিজেদের গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

অভিবাসী ও বাস্তুচ্যুতদের বিষয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক দর্শন: প্রভু যিশু নিজে তাঁকে খুনের পরিকল্পনাকারী হেরোদের হাত থেকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য সপরিবারে মিশরে শরণার্থী হিসেবে দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চিতের জীবন-যাপন করেছেন *(মথি:২:১৩-১৫,১৯-২৩)* এবং বাস্তুচ্যুতদের কষ্টভোগের অভিজ্ঞতা করেছেন। তিনি তাঁর শিক্ষায় দয়ালু শমরীয়'র গল্পের অবতারণা করে দেখিয়েছেন বিপদগ্রস্ত প্রতিবেশির জন্য আমাদের দায়িত্ববোধ কেমন হওয়া উচিত *(লুক:৯:২৫-৩৭)*। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, নগ্ন, অসুস্থ, অপরিচিত এবং বন্দীদের মধ্যে তাঁর মুখচ্ছবি ও উপস্থিতি অভিজ্ঞতা করতে *(মথি:২৫:৩১-৪৬)*। এই অভিবাসন প্রত্যাশি, বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সন্ধানে নিজ বাসস্থান, পিতৃপুরুষের কবর, ইতিহাস, ঐতিহ্য ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এদের বিষয়গুলো যখন আমরা বুঝতে পারবো, এদের কথা যখন আমরা শুনবো, এদের সেবা করবো, এদের সমস্যা নিরসনে ও স্থায়ী উন্নয়নে এদেরই সম্পৃক্ত করবো তখনই এই জগতে তারা স্বর্গরাজ্যের চিহ্ন দেখতে পাবে, ফিরে পাবে জীবনের আশা এবং পুনজাগরিত হবে ঈশ্বর বিশ্বাস। তখনই এই সেবা, ভালোবাসা, সহযোগিতা-সহমর্মীতার মাধ্যমে আমরা তাদেরই মাঝে খ্রিস্টের মুখচ্ছবি দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করবো। এটিই খ্রিস্টীয় পালকীয় দায়িত্বের মূলকথা।

আইনী বাধ্যবাধকতা

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জেনেভা কনভেনশন অনুসারে শরণার্থীদের আশ্রয় ও আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাওয়া একটি মৌলিক অধিকার যা আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং যা রাষ্ট্রপক্ষগুলো সম্মতি ও স্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের বলে 'Freedom of Movement' প্রতিটি মানুষের অধিকার, তাই সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে কোন মানুষ যদি জীবন রক্ষা, অধিকতর নিরাপত্তা, উন্নত জীবন ব্যবস্থা বা এমনতর কারণে স্থানান্তরিত হয়-ই তবে জেনেভা কনভেনশনের সুবাদে তারা অবস্থানরত রাষ্ট্রে সুরক্ষা ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে।

উত্তর আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্টের প্রশাসন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে এবং সর্বশেষ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে (চলমান) অভিবাসন আইন সংশোধন করে নিজেদের সুবিধা মত দুটি বিভাগে ভাগ করে নিয়েছে, একটি ইতিবাচক এবং অপরটি রক্ষণাত্মক। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আশ্রয়প্রার্থীদের অবৈধ্য অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্য প্রাচীর নির্মাণ চলমান আছে। লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়রা বিগত কয়েক দশক ধরে রাজনৈতিক সঙ্কট, অভ্যন্তরীণ সহিংসতা এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থা বা মন্দায় লক্ষ-লক্ষ মানুষ উত্তর আমেরিকায় ও ইউরোপে পারি জমাচ্ছে, তারা যেখানেই যাচ্ছে না কেন তাদের অভিবাসন বৈধকরণার্থে বৈধ আবেদনকারী বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সকলকেই পোহাতে হচ্ছে শরণার্থী কিংবা আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে দীর্ঘকাল আবার কাউকে কাউকে আজীবন অপেক্ষা করে যাপন করতে হচ্ছে মানবেতর জীবন। কখনো-কখনো তারা আবার নানা কারণে বিতাড়িত হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসছে, তাই লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এবং ক্যারিবিয় অঞ্চলের জন্য সুসংহত অভিবাসন নীতি প্রণয়ন জরুরী হয়ে পরেছে যেন বিপাকে পড়া মানুষগুলো আইনগতভাবে কষ্টের সুরাহা পায়।

পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয় দেশগুলো জেনেভা কনভেনশনের অভিবাসী নীতিমালা বাস্তবায়নে ও উন্মুক্ত সীমানা, স্থানান্তরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং শরণার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ মানের সুরক্ষা নিশ্চায়নের জন্য দেশগুলো যৌথভাবে একই মূল্যবোধের চর্চা ও সহভাগিতা করে চলছে যদিও যুক্তরাজ্যেও রয়েছে নিজস্ব নীতি ও আইন।

যদি কারো বৈধ কাগজপত্র না থাকে এবং সে যদি অত্যাচার নির্যাতনের ভয়ে পালিয়ে দেশ ত্যাগ করে থাকে তবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে তাকে শরণার্থী ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন করতে হয়ে এবং যদি আবেদন মঞ্জুর হয় তবে সর্বোচ্চ দুবছর সে সেখানে শরণার্থী হিসেবে থাকতে পারবে। এই অনুমোদন নবায়নযোগ্য এবং সে যদি কমপক্ষে পাঁচ বছর শরণার্থী হিসেবে সেখানে অবস্থান করে তবে স্থায়ী আবেদন করতে পারবে এবং মঞ্জুর হলে তাকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেয়া হয়। এর মানে এই যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার অভিবাসী ও শরণার্থীদের জন্য উদার নীতি গ্রহণ করেছে এবং সম্ভাব্য সহায়তা করে যা জেনেভা কনভেনশন ও মানবাধিকার বাস্তবায়নের একটি নমুনা।

বিশেষ করে আরব বিশ্বে ইসলামীক আইন (hijrah law) যুক্তি সঙ্গতভাবে আশ্রয়প্রার্থী এবং শরণার্থীদের (Mustaminun) আরো বেশি সুরক্ষা প্রদান করে যদিও এই আইন আধুনিক শরণার্থী আইনের চেয়ে অনেক আলাদা। গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলে এই আইন দ্বারা জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতদের সুরক্ষায় এটি বাপক অবদান রাখতে পারে, কমিয়ে আনতে পারে বর্তমান বিশ্বের শরণার্থীদের অসংখ্য সমস্যা।

দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জেনেভা কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা স্বাক্ষর ও সম্মতি জানালেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নানাবিধ কারণে এসব দেশে বহিরাগত আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা কম। কিন্তু এসব দেশ ত্যাগ করে বহির্বিশ্বে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। অন্যদিকে বাংলাদেশ সহ প্রায় প্রতিটি দেশেই রয়েছে নিজস্ব অভিবাসন ও শরণার্থী আইন যা কম-বেশি এই শ্রেণির মানুষদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চায়নে সহায়তা করে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় তিন লক্ষ উর্দূভাষী অভিবাসীকে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব প্রদান করে, অন্যদিকে দুই দফায় প্রায় তেরো লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী এখন আশ্রয় প্রত্যাশী বা প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশী যদিও বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের শরণার্থীর মর্যাদা দেয় না, যেহেতু তাদের জোর করে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং আইনগতভাবে মায়ানমার সরকারকে তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ অভিবাসন প্রেক্ষিত: অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক, শিক্ষা, পেশাগত কর্মসংস্থানের সুবিধা, জীবনমানের অপেক্ষাকৃত উন্নততর ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা কারণে মানুষ একস্থান থেকে অন্য স্থানে বিশেষ করে শহরমুখি হচ্ছে। বড়-বড় শহর, বন্দর-নগরী, শিল্প এলাকা, শিক্ষা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের চেয়ে অভিবাসীর সংখ্যাই বেশি। জীবন ও জীবিকার জন্য নিজ বসত-বাটি ছেড়ে নতুন জায়গায় জীবন-যাপন করতে গিয়ে স্থানীয় অভ্যন্তরীণ অভিবাসী হিসেবে তাদের মানবীয় সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, সেবা (সুপেয় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সুলভে বা ন্যায্য ভাড়ায় বাসা, অন্যান্য নাগরিক সেবা ও সুবিধা), চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, নিরাপত্তা, স্থানীয় প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিশ্চায়ন হচ্ছে কি-না এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দায়। এমাবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় সরকার বা কর্তৃপক্ষের বিধান অনুযায়ী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রদেয় ছয়টি পালকীয় যত্নের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সক্রিয় হলে এই অভিবাসীদের দৈনন্দিন ভোগান্তী লাঘব করা সম্ভব।

পরিশেষে: বিশ্বময় আন্তর্জাতিক কিংবা অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও বাস্তুচ্যুতি আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। সীমাহীন হচ্ছে তাদের দূর্ভোগ, লঙ্ঘিত হচ্ছে তাদের মানবাধিকার, বঞ্চিত হচ্ছে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা থেকে। অবহেলার চোখে মানুষ তাদেরকে একটি সংখ্যা দিয়ে পরিগণিত করে

১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা দেশী না বিদেশী

ফাদার সাগর কোড়াইয়া

বাংলার আলো, বাতাস ও মাটিতেই বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তবু বাংলাদেশে অনেকেই খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবেন। এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তিও আছে। আবার বাংলাদেশী খ্রিস্টানরা যে বিদেশী নয় এটাও দিনের আলোর মতো সত্য। এ দেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন ৫০০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তার আগে পূর্বপুরুষগণ হিন্দু ধর্মের অনুসারীই ছিলো। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামা ভারতবর্ষে আসার পর পরবর্তীতে ফ্রান্সিসকান, ডমিনিকান ও কার্মেলাইট মিশনারীগণ এদেশে আসতে থাকেন। তাদের প্রধান লক্ষ্যই ছিলো বাণীপ্রচার। মিশনারীগণ সফলও হয়েছেন। বাংলাদেশে পাদ্রীশিবপুর, চট্টগ্রাম, দিয়াং, ভাওয়াল ও আঠারগ্রামসহ আরো বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য ও মিশনকেন্দ্র স্থাপন করেন। এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায় ধর্মীয় ও সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হন। পরবর্তীতে আরো বহু ইতিহাস ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় খ্রিস্টানগণ বাংলাদেশে নানাভাবে অবদান রেখে চলেছে তবু খ্রিস্টানদের বিদেশী তকমাটি যেন কোনমতেই খসানো যাচ্ছে না। বাংলাদেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা খুবই সীমিত। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি মাত্র ০.০৩%। এই সংখ্যার মধ্যে বাঙালি এবং বিভিন্ন আদিবাসী খ্রিস্টানগণ সংযুক্ত। বাঙালিগণ অবশ্যই বাঙালির কাতারেই পড়েন। আর যারা আদিবাসী আছেন তারা আদিবাসী হিসাবে পরিচিত; তবে সবাই বাংলাদেশী এতে কোন অনিশ্চয়তা নেই। আর অন্যদিকে বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবার কোন যুক্তিই খাঁটে না। কারণ এদেশে বাঙালি খ্রিস্টানদের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। আবার আদিবাসী খ্রিস্টানগণ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেবার আগে থেকেই যুগ-যুগ ধরে এদেশে বসবাস করে আসছেন। দীক্ষা নেবার পূর্বে স্ব-স্ব বিশ্বাসে তারা বিশ্বাসী ছিলেন। তবুও বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের বিষয়ে কিভাবে যেন বিদেশী ভাবার মনোভাব অন্যদের মধ্যে শিকড় গেঁথে আছে। বাংলাদেশে এমন অনেক জেলা আছে যেখানে তেমনভাবে খ্রিস্টানদের বসবাস শুরু হয়নি। চাকুরীর সুবাদে হয়তো অস্থায়ীভাবে অনেকে বসবাস করেন। আবার বাংলাদেশে অন্য ধর্মাবলম্বী অনেকেই আছেন যারা খ্রিস্টানদের চাক্ষুস দেখেনি। খ্রিস্টানদের সমন্ধে তাই তাদের নানাবিধ ধারণা বিদ্যমান। আর এই নানাবিধ ধারণার মধ্যে খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবার ধারণাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। আমরা যদি নিজেদের নিজেরা প্রশ্ন করি 'কেন অন্যরা বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবেন' তাহলে হয়তো উত্তর আপনি বেরিয়ে আসবে।

আমি তখন ছোট। আমাদের গ্রামের একটি হিন্দু পরিবারে দূরের হিন্দু আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে এসেছে। তারা শুনেছে যে এখানে খ্রিস্টানদের বাস। আগে কখনো তারা খ্রিস্টান দেখেনি। আর তাই আমাদের বাড়িতে দূর থেকে আসা হিন্দুদের নিয়ে আসা হলো। এসে তো তাদের চক্ষু চড়কগাছ! শেষে বলেই ফেলেছেন, আরে খ্রিস্টানরা দেখছি আমাদের মতোই। শরীরের রং তো ধবধবে লাল; ফর্সা নয়। অর্থাৎ টেলিভিশনে ইউরোপীয় বা বিদেশী খ্রিস্টানদের দেখে তাদের ধারণা ছিলো যে, খ্রিস্টানদের শরীরের রং ধবধবে লাল ফর্সা হয়। শুধুমাত্র দূর থেকে আসা সেই হিন্দু লোকজনই নন; বরং আরো অনেকের মধ্যে খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবার ধারণা বদ্ধমূল। ভারতীয় উপমহাদেশে সনাতন ধর্ম ব্যতিত অন্য প্রত্যেকটি ধর্মই বলা চলে বিদেশী। মিশনারী, ধর্মপ্রচারক, অলি-আউলিয়া, দরবেশ, সুফী, সাধকদের দ্বারা বিদেশী ধর্মগুলো এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই উপমহাদেশের মাটিতে বিদেশী ধর্মগুলো দিনে-দিনে স্বদেশী হয়ে ওঠেছে। আর এটা হওয়াই স্বাভাবিক-যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু তাই খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে সংখ্যাগুরুদের ধারণা স্বল্প। তাই সংখ্যাগুরুদের মাঝে সংখ্যালঘুরা অনেকটা বিদেশীর মতো। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে ইউরোপীয়রা বিশেষভাবে পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্পেন ও ব্রিটিশরা লম্বা সময় ধরে বাণিজ্য ও পাশাপাশি মিশনারীরা খ্রিস্টবাণী প্রচার করেছে। ফলে এ দেশীয় যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে বা ইতিহাসে পড়েছে তাদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, এ দেশের খ্রিস্টানরা বিদেশী একটি ধর্ম দ্বারা দীক্ষিত হয়ে বিদেশীদের মতো বা বিদেশী হয়েছে।

বাংলাদেশী প্রত্যেক খ্রিস্টানের দেশীয় নামের পাশাপাশি সাধু-সাধ্বী বা খ্রিস্টান নাম রয়েছে। আর সাধু-সাধ্বীর নামগুলো সবই এসেছে বিদেশী ভাষা-সংস্কৃতি থেকে। অনেক সময় অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে চলাফেরায় অন্যেরা সাধু-সাধ্বীর নামগুলো উচ্চারণ করতে এবং লিখতেও পারে না। তখন তাদের জন্য বেশ জটিল হয়ে পড়ে নামগুলো। এছাড়াও বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের নাম ও বিদেশীদের নামগুলো একই হওয়ায় তাদের কাছে নামের সাথে-সাথে ব্যক্তিকেও বিদেশী ভাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে রয়েছে বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের পদবী। বিশেষভাবে যারা পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারা দীক্ষালাভ করেছে তাদেরকে পর্তুগীজদের ব্যবহৃত পদবীগুলোই দেওয়া হয়েছে। যেমন- কস্তা, রোজারিও, গমেজ, ডি' সিলভা, পেরেরা, আলমিদা, ক্রুজ, রিবেরু, দেশাই, ডি' সুজা, পালমা, কোড়াইয়া, পিরিচ, ছেরাও, রড্রিক্স, রেগো, পিউরীফিকেশন, টলেন্টিনো, পিনেরু, আঞ্জুস, দরেস, ম্যাথিউস, ফার্নাণ্ডেজ, কৈলু। আর এই পদবীগুলো অন্য ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশীরা বিদেশী হিসাবেই জানে। অবশ্য পর্তুগীজদের আমল শেষ হলে যারা দীক্ষালাভ করেছে তাদের পদবীগুলো একই আছে। এরপরেও কেন জানি বাংলাদেশী খ্রিস্টানদেরকে বিদেশী ভাবার মনোভাবটা অপরিবর্তনীয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার আগ পর্যন্ত এদেশীয় খ্রিস্টানগণ বিদেশী একটি ভাবধারার মধ্যেই বেড়ে উঠছিলো। দেশীয় খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিকতা, মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা বিদেশী ভাষা-কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্বারা ছিলো প্রভাবিত। খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হতো লাতিন ভাষায়। অধিকাংশ খ্রিস্টবিশ্বাসী লাতিন ভাষা না বুঝেই প্রার্থনা, প্রার্থনার উত্তর ও ধর্মীয় সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতো। সেই সময় যদি কেউ নিজেকে বিদেশী নাও ভাবতে চাইতো তবুও তাকে বিদেশী ভাবতেই হতো। কারণ উপাসনায় সব কিছুই

ছিলো বিদেশী ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার পরে দেশীয়করণের আন্দোলন বেশ জোরদার হয়। এখন অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে- কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি বিদেশী তকমা।

এমন এক সময় গিয়েছে যখন দেশীয় যাজকদের সংখ্যা ছিলো হাতেগোনা। দেশের অধিকাংশ ধর্মপল্লীগুলোই পরিচালিত হতো বিদেশী ফাদারদের দ্বারা। বিদেশী ফাদারদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র নিজেদের একদম বাঙালিয়ানায় রূপান্তরিত করতে পেরেছেন। বিদেশী ফাদার দেখে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, খ্রিস্টানরা বিদেশী। বিদেশী মিশনারীরা অন্য ধর্মের জনগণের সাথেও মিশেছেন। আর অন্য ধর্মের জনগণ বিদেশী ফাদারদের সাহেব বলে সম্বোধন করতো। এখনো পর্যন্ত বাঙালি ফাদারদের অনেকেই সাহেব বলেই সম্বোধন করে। বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবার আরেকটি কারণ হতে পারে খ্রিস্টানদের একে-অপরের সাথে সম্বোধন, আচার-আচরণ ও বিয়ের অনুষ্ঠান। একে অপরের সাথে দেখা হলে অনেকেই ইংরেজী রীতি অনুযায়ী গুড মর্নিং, গুড আফটার নুন, গুড ইভনিং, গুড নাইট বলে এবং হাতে চুম্বন করার মধ্যদিয়ে সম্বোধন ও শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। সত্যি বলতে কি- এই রীতি-নীতি সবই বিদেশী সংস্কৃতি থেকে ধার নেওয়া। দেশীয় রীতি অনুযায়ীও সম্বোধন করা হয় তবে তা কদাচিৎ লক্ষণীয়। এছাড়াও বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিয়ের অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই যে বিদেশী রীতিতে সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধারণা রয়েছে। বিশেষভাবে নব দম্পত্তির পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে বিদেশী ভাবধারাই দেখা যায়। বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবার ক্ষেত্রে খাবার-দাবার অন্যতম। বাংলাদেশী খ্রিস্টানরা পর্তুগীজদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পর্তুগীজদের অনেক খাবারে অভ্যস্ত; খাবারের মধ্যে বিক্কা পিঠা, বিন্দালু, আচার অন্যতম।

অনেক আগে থেকেই বাঙালি খ্রিস্টান অনেকেই বিদেশী বিশেষভাবে ইউরোপীয়দের হাউজে চাকুরী করার সুবাদে নিজেদের আচার-আচরণ, চলাফেরা, জীবন যাপন ও কথাবার্তায় বিদেশী মনোভাব গড়ে তুলে। এখনো পর্যন্ত অনেকেই ঢাকাসহ দেশ ও দেশের বাইরে বিদেশী হাউজে চাকুরী করে। আবার অনেক সময় সখ্যতার কারণে অনেক বিদেশী তার অধিন্যস্ত কর্মচারীদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতেও আসে। বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদেশীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করে অন্য ধর্মাবলম্বীরা খুব সহজেই বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিদেশীদের কাতারে ফেলে বিদেশী বলে। বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের অনেকের মধ্যেই বিদেশে যাবার আগ্রহ লক্ষ্যণীয়। বিশেষভাবে ভাওয়াল, আঠারোগ্রাম, পাবনা, নাটোর, চট্টগ্রাম, বরিশালসহ দক্ষিণবঙ্গের অনেক বাঙালি খ্রিস্টান দেশের বাইরে অভিবাসী হিসাবে বসবাস করে। অভিবাসী হওয়ার আগ্রহ এখনো পর্যন্ত অনেকের মধ্যে দেখা যায়। আর এই চিত্র অন্যদের মধ্যে 'বাংলাদেশী খ্রিস্টানরা যে বিদেশী' সে মনোভাবের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায় ক্ষুদ্র হলেও শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখছে। দেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশীদের নিয়ম-কানুন, আদব-কায়দা ও শৃঙ্খলাগুলো শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদেশী শিক্ষক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে বিদেশী ডাক্তারের সেবা প্রদানের কারণে অনেকে বাংলাদেশী খ্রিস্টনদেরও বিদেশীদের কাতারে ফেলে। বাংলাদেশে অবস্থানরত খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উপাসনালয় বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিষয়ে অন্যদের বিদেশী ভাবতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি গির্জাতে বিদেশী কৃষ্টি ও গঠন প্রণালী লক্ষ্যণীয়। প্রতি বছর বহু অন্য ধর্মাবলম্বী গির্জা তথা ধর্মপল্লী দেখতে আসে। ফলে তাদের মধ্যে গির্জার সম্বন্ধে একটি ধারণা আসে যে, গির্জাগুলো বিদেশী ভাবধারায় স্থাপিত। আর এ থেকে তাদের মধ্যে খ্রিস্টানদের বিদেশী ভাবার বিষয়টি আরো জোরদার হয়।

আসলেই কি বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা বিদেশী! খ্রিস্টানদের বিষয়ে অন্যদের মনের কথাগুলো বিশ্লেষণ করলে এই কথাই প্রতীয়মান হয়ে যে, বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা বিদেশী। কিন্তু আসল সত্য হচ্ছে- বাংলাদেশে খ্রিস্টানরা অবশ্যই বিদেশী নয় বরং দেশী। আমরা সবাই কোন না কোনভাবে বিদেশী কৃষ্টি-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। আর বিদেশী কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে নিজের মতো করে নিলেই যে একজন বিদেশী হয়ে উঠে সেটার কোন যুক্তি নেই। বাংলাদেশে খ্রিস্টানগণ যুগ-যুগ ধরে বাস করে কেউ বাঙালি আবার কেউ বাংলাদেশী হয়ে ওঠেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের খ্রিস্টানদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। তাই বাংলাদেশী খ্রিস্টানরা কোনমতেই বিদেশী হতে পারে না। আর যারা বিদেশী ভাবে কোনমতে সেটা তাদের দোষ নয়; কারণ উল্লিখিত কারণগুলো প্রত্যক্ষ করে তাদের মনে এই ধারণা জোরদার হয়েছে যে, বাংলাদেশী খ্রিস্টানরা বিদেশী। আমাদের প্রত্যেকজন বাংলাদেশী খ্রিস্টানের দায়িত্ব অন্যদের মধ্যকার এই ধারণা পরিবর্তনের। অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছুই পরিবর্তন করতে পারবো না ঠিকই, তবে কেউ যেন বাংলাদেশী খ্রিস্টানদের বিদেশী বলতে না পারে সেদিকে যতটুকু সম্ভব খেয়াল রাখা প্রয়োজন॥

আইন, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ....

১৫ পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করছে। দেশের ভেতরে যেমন দেশের বাইরেও তেমনি অগণিত মানুষ বাধ্য হচ্ছে নিজের বসত-বাটি ত্যাগ করতে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রিয় প্রণীত আইনগুলোর বাস্তবায়নের স্বদিচ্ছা আবশ্যক। পাশাপাশি তাদের জন্য প্রয়োজন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নয়নের বাস্তবমুখী সেবা, সহভাগিতা, সহযোগিতা ও সহমর্মীতার নানা পদক্ষেপ। তবেই এই জগতে বিতাড়িত, বঞ্চিত, অবহেলিত, নির্যাতিত, ক্ষুধার্ত, নগ্ন, বন্দী মানুষগুলো ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করে নিজ নিজ জীবনে ফিরে পাবে আশার আলো। জগত থেকে দূরীভূত হবে শরণার্থী নামক ক্রুশ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

1. *Pope Francis (2020); Forced like Jesus to flee*
2. *Pope Francis; Laodato Si,*
3. *Irregular Migration & Return*
4. *Asylum seeker and refuge permits*
5. *Claiming Asylum in the USA (2019)*
6. *(2020);Forced migration or displacement*
7. *Vincent Chetai; (2014); Armed Conflict and Forced Migration: A Systematic Approach to International Humanitarian Law, Refugee Law, And International Human Rights Law.*

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
রেজি নং - ২৮২ ০৬-০৬-১৯৭৮
তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ১৪৫ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
+৮৮ ০২ ৫৮১৫০০২৭, +৮৮ ০২ ৫৮১৫০০২৮, info@mcchs.org, www.mcchsl.org

৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ : ৯ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার
সময় : সকাল ১০টা
স্থান : কাল্পব রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

এতদ্বারা দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ -এর সম্মানিত সকল প্রতিনিধিদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৯ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার, সকাল ১০টায় কাল্পব রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী, কালিগঞ্জ, গাজীপুরে অত্র সোসাইটির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন করে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সাধারণ সভায় নিজ-নিজ পরিচয়পত্র/ছবিযুক্ত পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে সকলের সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি।

০১। উপস্থিতি গণনা, আসন গ্রহণ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা
০২। মৃত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন
০৩। চেয়ারম্যানের স্বাগত ভাষণ
০৪। সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্য

সাধারণ সভার কর্মসূচী :

৫. ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন;
৬. ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৭. বার্ষিক হিসাব বিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন;
৮. উদ্বৃত্ত পত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
৯. বাজেট (আয়-ব্যয়) পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
১০. সোসাইটির আয়বর্ধক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
১১. উপবিধি সংশোধন;
১২. ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
১৩. অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
১৪. বিবিধ;
১৫. লটারী ড্র;
১৬. ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা;

আগামী ৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে সকাল ১০:০০ টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

(ইম্যানুয়েল বাপ্পী মন্ডল)
সেক্রেটারি, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
তারিখঃ ২০/৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

* সমবায় সমিতি আইন ২০০১-এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন প্রতিনিধি সমিতিতে শেয়ার/ঋণ/অন্যান্য বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এবং সদস্যপদ স্থগিত থাকলে উক্ত প্রতিনিধি সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা থেকে বিরত থাকবেন।

গল্পে-গল্পে সাধু-সাধ্বী

জাসিন্তা আরেং

এক বিকেলে দাদু ও নাতি দুজনে মিলে হাঁটতে বের হল। হাঁটতে-হাঁটতে নাতি ধর্মক্লাসে নতুন কি শিখেছে তা জানতে চাইল দাদু। নাতি বলল, 'আজ আমাদের ধর্মশিক্ষক সাধু-সাধ্বীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমি যেইনা শিক্ষককে প্রশ্ন করব, অমনি ছুটির ঘন্টা বেজে গেল; তাই আর কোন সাধু-সাধ্বীর বিষয়ে জানাই হল না। আচ্ছা দাদু, তুমিও কি আমার মত ধর্মক্লাসে সাধু-সাধ্বীদের বিষয়ে জেনেছ? দাদু বলল, হ্যাঁ দাদুভাই, তবে ধর্মক্লাস থেকে নয়। আমি যখন তোমার মত ছিলাম, তখন আমি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে সাধু-সাধ্বীদের সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। নাতি বলল, দাদু, তাহলেতো তোমার অনেক কিছু জানা আছে। তুমি আমাকে একটু বল না আসলে সাধু কেমনে হয়! সাধু কি ভগবানের মতই দয়ালু? দাদু বলল, হ্যাঁ, তারা দয়ালু। শোন দাদু, একজন সাধু ছিলেন যিনি শৈশবকাল থেকেই উদার ও দয়ালু প্রকৃতির ছিলেন। তিনি শুধু কাছের মানুষদের জন্য নয়, চেনা-অচেনা মানুষদের জন্য সবসময় প্রার্থনা করতেন। তিনি গরীব, অনাথ, ক্ষুধার্ত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অকাতরে সেবা করতেন। তার নাম হলো সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল। তিনি গরীবদের ভীষণ ভালবাসতেন। যাদের অসুখ-বিসুখ হতো ও কষ্টে থাকতো, তাদের ঔষুধপত্র কিনে দিতেন। যারা না খেয়ে থাকত, তাদের বাড়ি গিয়ে খাবার দিয়ে আসতেন। যারা তোমার মত শিশু ছিল, মা-বাবা ছিল না, সেবা-যত্ন করার কেউ ছিল না, তিনি তাদেরকে তার কাছে রাখতেন ও সেবা-যত্ন করতেন। আবার যারা আমার মত বুড়ো ছিল, তাদেরকেও যত্ন নিতেন। গরিব-দুঃখীদের প্রতিও তিনি ছিলেন উদার ও দয়ালু, তাই তাকে 'গরীবদের বন্ধু' ও সকলকে ভালবাসতেন বলে, তাকে 'ভালবাসার সাধু'ও বলা হয়। নাতি বলল, দাদু, তিনি এখন কোথায় আছেন? আমি কি সাধু

ভিনসেন্টকে দেখতে যেতে পারব? দাদু বললেন, দাদুভাই, তিনিতো কোন এক কাকডাকা ভোরে ঈশ্বরের সেবা করতে তাঁর কাছে চলে গেছেন। তাই নিয়ে মন খারাপ করো না। তবে তুমি যখন বড় হবে, তখন সাধু-সাধ্বীদের বইতে তার সম্পর্কে আরও জানতে পারবে।

নাতি বলল, দাদু, সাধুর বিষয়ে না হয় জানলাম, এমন সাধ্বীও কি আছে? দাদু বলল, থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। তাহলে শোন দাদুভাই- একজন সাধ্বী ছিলেন, যিনি ছিলেন ভীষণ নম্র, সরল ও বাধ্য, তার নাম হলো শিশু যিশুর সাধ্বী তেরেজা। নাতি বলল, দাদু, সাধ্বী তেরেজার কি কি গুণাবলী ছিল? দাদু বলল, তিনি সর্বদা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আস্থা রাখতেন এবং শিশু যিশুকে ভীষণ ভালবাসতেন। তিনি কখনও রাগ, লোভ ও হিংসা করতেন না। অন্যের জন্য তার মনে কখনই খারাপ চিন্তা আসতো না। তাছাড়া, তিনি ছিলেন ভীষণ নম্র স্বভাবের মানুষ। তিনি সবসময় হাসিমুখে কথা বলতেন। তার সরল ও বিনয়ী কথাবার্তার কারণে সকলেই তার প্রশংসা করতো। নিজেকে নিয়ে কখনও বড়াই করতেন না। ধনী-গরীব, সুস্থ-পীড়িত সকলকে তিনি একই চোখে দেখতেন। তিনি গরীর লোকদের ভালবাসতেন ও সেবা করতেন। তিনি মাত্র ২৪ বছর বয়সে ৩০ সেপ্টেম্বর মাসে মারা যান। নাতি বলল, দাদু আমিও সাধ্বী তেরেজার মত আমার বন্ধুদের সাথে হাসিমুখে কথা বলব, কারো সাথে হিংসা করবো না এবং সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের মত ধনী-গরীব সবাইকে ভালবাসব। নাতির কথা শুনে দাদু বেশ আনন্দিত হলেন। নাতি বলল, আচ্ছা দাদু, এমন সাধু-সাধ্বী কি আরও আছে? দাদু বলল, অনেক সাধু-সাধ্বী রয়েছে যাদের নাম তুমি জান না। তারা হলেন, সাধ্বী আগেশ, সাধ্বী মারীয়া গরেট্টি, লিমার সাধ্বী রোজ, সাধু মার্টিন দ্য পোরেস, সাধ্বী লুসি, সাধু স্তেফান ও সাধু খ্রিস্টফার প্রমুখ। অন্য কোনদিন তাদের গল্প তোমাকে শোনাব, কেমন দাদুভাই। দাদু বলল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হয়ে গেছে, চল এবার বাড়ি ফেরা যাক; তোমাকে আবার আগামীকালের বাড়িকাজ করতে হবে। সময়মত না পৌঁছালে তোমার মা কিন্তু রেগে যাবে। নাতি বলল, হ্যাঁ, তাইতো। চল তাহলে আমরা বাড়ি ফিরে যাই। কাল আমি সকাল-সকাল স্কুলে যাব এবং সাধু ভিনসেন্ট ও সাধ্বী তেরেজার কথা বন্ধুদের বলব।

ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা এই গল্প থেকে সাধু ভিনসেন্ট ডি'পল ও শিশু যিশুর সাধ্বী তেরেজার সুন্দর, পবিত্র ও নিবেদিত জীবনের কথা জানতে পারলাম। এসো আমরা নিজেদের জীবনে তাদের অমূল্য গুণগুলোর অনুশীলন করি যেন আমরাও মনে-প্রাণে, কথায়-কাজে সাধু বা সাধ্বী হয়ে উঠতে পারি। তবে আমরা যদি আমাদের দাদু-দিদিমার সাথে এভাবেই মাঝে-মাঝে গল্প করি তবে কত কিছুই না জানতে পারব॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১. গমেজ ফ্রান্সিস; ২০১২; ছোটদের সাধু-সাধ্বী

২. রোজারিও ফাদার আলবাট টমাস; ২০১৫; সাধু-সাধ্বীদের জীবনকথা

রোজ মারীয়া গমেজ
সেন্ট থেক্‌লাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বড়গোল্লা

রাজশাহী ডাইয়োসিসে বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা- ২০২০

ফাদার সুনীল রোজারিও

ভূমিকা : প্রতি বছরের মতো এবারও রাজশাহী কাথলিক ডাইয়োসিসে অনুষ্ঠিত হলো ১৮তম বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা-২০২০। তিনটি ভিকারিয়াতে আলাদাভাবে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ভিকারিয়াতে পালকীয় কর্মশালা সমাপ্ত হওয়ার পর সেপ্টেম্বরের ১১-১২ তারিখে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে যৌথভাবে পালকীয় সম্মেলনের মধ্যদিয়ে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের পালকীয় কর্মশালার যবনিকা টানা হয়। পালকীয় কর্মশালার মূল বিষয় ছিলো: ***আমরা হলাম দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক***।

পূর্ব কথা : ১৮তম বার্ষিক পালকীয় কর্মশালা সামনে রেখে ডাইয়োসিসের বিশপ জের্ভাস রোজারিও একটি পালকীয় পত্র প্রকাশ করেন। শুরুতেই তিনি করোনাভাইরাসের কোভিড-১৯ মহামারির কথা উল্লেখ করে বলেন, "জগত সৃষ্টির সময় তো এই ভাইরাস ছিলো না! তাহলে কীভাবে এখন এলো? মানুষের বা মানবজাতির কোনো দায় এতে নেই তো?" ঈশ্বর সবকিছু মুখের কথায় সৃষ্টি করলেও, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজের হাত দিয়ে এবং নিজের প্রতিমূর্তিতে। পরে ঈশ্বর "এর সব দায়িত্ব মানুষকে দিয়েছেন, যত্ন ও রক্ষণা-বেক্ষণ করতে, আর আমরা তা মানিনি। আমরা পৃথিবীকে সবুজ ও পরিস্কার রাখিনি।" পোপ ফ্রান্সিসের 'তোমার প্রশংসা হোক' সর্বজনীন পত্রের বরাত দিয়ে বিশপ বলেন, "এই পৃথিবীর সম্পদ সবই দিয়েছেন ঈশ্বর, আর তা তিনি দিয়েছেন সকল যুগের, সকল দেশের সকল জাতি-গোষ্ঠী মানুষের জন্য। আমরা পৃথিবীর সম্পদ স্বার্থপরের মতো শুধু আমরাই ভোগ করছি- আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সঞ্চয়, রক্ষণা-বেক্ষণ বা বাড়িয়ে তোলার মনোভাব বা আগ্রহ দেখাইনি।" তিনি বলেন, পরিবেশ বাঁচাও-পৃথিবী বাঁচাও- আন্দোলনের সম্মুখভাগেই রয়েছে বিশ্ব কাথলিক চার্চ। পোপের নেতৃত্বে "আমাদের অভিন্ন বসত-বাটী" এই ধরিত্রী মাতার যত্নের আবেদন জানানো হলেও মানুষের স্বার্থ, লোভ ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার কারণে বিশ্ব পরিবেশ আজ বিপর্যয় ও হুমকীর মধ্যে। ফলে বিশ্বের ওপর নেমে আসছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারি।

আলোচ্য বিষয়বস্তু- ১: যিশু ও মণ্ডলীর শিক্ষায় আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবক- বিষয়ের ওপর আলোচনা উপস্থাপন করেন ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিও। তিনি বলেন, "ঐশতাত্ত্বিক ও মণ্ডলীর এতিহ্য অনুসারে সেবক হয়ে ওঠা" প্রতিটি ভক্তের প্রথম কাজ। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবককে যেমন গৌরব করতে হবে ঈশ্বরের, তেমনি লালন-পালন করতে হবে তাঁর সৃষ্টিকে। ফাদার রোজারিও বলেন, "এই পৃথিবীর সম্পদ সবই দিয়েছেন ঈশ্বর, সকল যুগের, সকল দেশের, সকল জাতিগোষ্ঠী মানুষের জন্য। তিনি বলেন, যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তারাই বিশ্বাসী এবং তারাই সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। দায়িত্বশীলতার মধ্যদিয়ে মানুষ প্রভুর প্রকৃত সেবক হয়ে উঠতে পারে। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই তার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাশা, পৃথিবীতে তিনি মানুষের হাতে যা কিছু ন্যস্ত করেছেন- মানুষ যেন তা নিয়ে "উৎপাদনশীল, দায়িত্বশীল, দায়বদ্ধ ও বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে।"

আলোচ্য বিষয়বস্তু-২: রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাস্তবতা ও দায়িত্বশীল সেবক হিসেবে আমাদের করণীয় :- বিষয়ের ওপর আলোচনা উপস্থাপন করেন, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক, সুক্লেশ জর্জ কস্তা। কস্তা তার আলোচনার শুরুতেই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তব পরিসংখ্যাণ তুলে ধরেন। তারপর তিনি আজকের বাস্তবতায় ও সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন দায়িত্বশীল সেবক কোন বিষয়গুলো বা ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করতে পারেন- তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন; আর বিষয়গুলো হলো:- **১.** পরিবার- পরিবার হলো মণ্ডলীর কোষ। একজন শিশু পরিবার থেকে যা শিক্ষা গ্রহণ করে তা সে কর্মজীবন ও ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করে থাকে। **২.** খ্রিস্টেতে দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর সদস্যপদ লাভ করি।... প্রকৃত অর্থে প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবার এক একটি গৃহমণ্ডলী। তাই মণ্ডলীর একজন সভ্য হিসেবে এর প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে সেবাকর্ম করা আমাদের দায়িত্ব। **৩.** সমাজ- মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস ক'রে আমরা সামাজিকীকরণ শিখি ও সামাজিক হয়ে ওঠি। সমাজ অর্থ-অনেকে একসাথে, সকলের তরে সকলে, পরস্পরের তরে পরস্পরে। **৪.** বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি- আমাদের দেশের শতকরা ১০% মানুষ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। অসচেতনতা, পুষ্টিহীনতা, ঘন বসতি, বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনা, চিকিৎসার সুযোগ না পাওয়া, ইত্যাদি কারণে একজন স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। **৫.** প্রবীণ ব্যক্তি- আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে-সাথে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের এই প্রবীণগণ জ্ঞান ভাণ্ডার ও সমাজের সম্পদ। তাদের যত্ন নেওয়া ও ভালোবাসা আমাদের দায়িত্ব। **৬.** অসুস্থ ব্যক্তি- সুস্থ মানুষ শক্তিধর ও ক্ষমতাশালী। কিন্তু মানুষ অসুস্থ হলে উপলব্ধি করে তার অসহায়ত্ব এবং প্রত্যাশা করে অন্যের সহায়তা। বর্তমানে এই করোনাকালে আমরা প্রতিনিয়ত তা উপলব্ধি করছি। কেউ অসুস্থ হলে তার কাছে কেউ যেতে চায় না; সঠিক চিকিৎসা পায় না। এমনকী কেউ মারা গেলেও তার কাছে যেতে চায় না। তাই অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ করা, সেবা দেওয়ার জন্য দায়িত্বশীল সেবকের খুবই প্রয়োজন। **৭.** চাকুরিজীবী-ধর্মপ্রদেশের অধিকাংশ খ্রিস্টভক্ত নানা অনানুষ্ঠানিক কাজের সাথে যুক্ত। ফলে তাদের চাকুরির নিশ্চয়তা কম থাকে এবং চাকুরিকালে কাজের ব্যস্ততা ও ছুটি-ছাঁটার সীমাবদ্ধতার কারণে মণ্ডলীর কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকে। এমনকী চাকুরি শেষে তাদের অনেকে অসহায়ের মতো জীবন যাপন করে। **৮.** দরিদ্র ও অভাবী মানুষ- বর্তমানে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র ও অভাবের পাশাপাশি মানসিক দরিদ্রতায়ও ভুগছে। তাই মানুষের মধ্যে হতাশা, অতিমাত্রায় লোভ, সংকীর্ণতা কাজ করছে। **৯.** শিক্ষা কার্যক্রম- গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব। এ শিক্ষা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয় বরং নানাবিধ অপ্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক এবং মাণ্ডলিক শিক্ষার সাথে যুক্ত। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করে আলোচক বিষয়ের ইতিবাচক, নেতিবাচক এবং করণীয়সমূহ উল্লেখ করেছেন। **১০.** পরিবেশ ও প্রতিবেশ- সবশেষে সুক্লেশ কস্তা এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বিশপের পালকীয় পত্র, পোপের সর্বজনীন পত্র, 'তোমার প্রশংসা হোক'-থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের ধরিত্রী ও তার বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। উপসংহারে আলোচক বলেন যে, দায়িত্বশীল সেবক হিসেবে আমরা যা দান করতে পারি তা হলো- সময়, মেধা-বৃদ্ধি এবং সম্পদ। তাই আমরা যদি সেবাকাজে মাথা, হাত ও হৃদয় সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে সেবাকাজে আমাদের সফলতা আসবেই।

যৌথ/কেন্দ্রিয় কর্মশালা : সেপ্টেম্বরের ১১/১২ তারিখে খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে তিনটি ভিকারিয়া যৌথভাবে পালকীয় কর্মশালার সমাপ্তি টানে। যৌথ কর্মশালায় তিনটি ভিকারিয়ায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার ফলাফল/বিবরণ উপস্থাপন করা হয়। মুক্ত আলোচনায় অনেকে তাদের

১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ (ভার্চুয়াল) কর্মশালা - ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এপিসকপাল যুব কমিশন ডেস্ক: এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে গত ১-৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ভার্চুয়ালি 'জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার মূলসুর ছিল: "You are Called to Enlighten the Mind and Heart of YCS'er." বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সিস্টার, ব্রাদার, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ধর্মপ্রদেশীয় এনিমেটরসহ মোট ৬০জন এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চেয়ারম্যান, এপিসকপাল যুব কমিশন। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন- বিশেষ পরিস্থিতির কারণে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পথ চলতে হবে, ঠিক যেভাবে যিশু এম্মাউসের পথে শিষ্যদের সাথে পথ চলেছিলেন। যাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ অনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে এই ওয়াইসিএস আন্দোলনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। এরপর তিনি 'জাতীয় ওয়াইসিএস এনিমেটর গঠন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২০২০ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অতপর ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন 'কোর্স পরিচিতি ও নিয়মাবলী, প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা দেন এবং মূল বিষয় "You are Called to Enlighten the Mind and Heart of YCS'er." -এর ওপর উপস্থাপনা রাখেন।

২য় দিনে ১ম অধিবেশনে 'History, Identity and Challenges of YCS' এ বিষয়ে সহভাগিতা করেন সিস্টার রোজলীন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম, জাতীয় এনিমেটর, ওয়াইসিএস বাংলাদেশ। এবং ২য় অধিবেশনে 'Methodology of YCS and Role Modeling of an Animator' এ বিষয়ে সুদূর আমেরিকা থেকে সহভাগিতা করেন বনি লিওনার্ড পালমা। তিনি বলেন, একজন YCS এনিমেটর হওয়া অনেক বড় একটি দায়িত্ব। শুধু এনিমেটর হলেই হবে না ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পথ চলতে হবে তাদের মত করে তাদেরকে বুঝতে হবে ও গঠনে সাহায্য করতে হবে।'

৩য় দিনে ১ম অধিবেশনে 'Students' reality in Bangladesh today and how to develope YCS' এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন ড. ব্রাদার লিও জেমস পেরেরা সিএসসি, সহকারী রেজিস্টার, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ। তিনি বলেন, 'শিক্ষক বা এনিমেটর হিসেবে বর্তমান জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের মনোভাব, প্রত্যাশা, চাওয়া-পাওয়া ও প্রয়োজন অনুধাবন করে তাদের সাথে যাত্রা করতে হবে।' একটি দিনে ২য় অধিবেশনে 'YCS Spirituality & 'Laudato Si' Year' এই বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার যাকোব অনিল দাস এসডিবি, এশিয়ান চ্যাপলেইন, আইওয়াইসিএস, এশিয়া। তিনি তার উপস্থাপনায় YCS এর আধ্যাত্মিকতার আলোকে আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্নের জন্য YCS'er দের কিছু কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব ও দিক-নির্দেশনা দান করেন।

৪র্থ দিনে ১ম অধিবেশনে 'YCS সেল মিটিং কী ও এর পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। এছাড়া ছিল দলীয় উন্মুক্ত আলোচনা, মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। সমাপনী অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন সিস্টার, ব্রাদার, টিচার ও এনিমেটর তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। পরিশেষে, সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশে যুব এনিমেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ-২০২০

ফাদার তিতুস তিতাস মৃ: গত ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০২০, দু'দিনব্যাপী, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের সামাজিক পালকীয় কেন্দ্রে মোট ৫৫জন যুবাদের নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণটি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভ উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের যুবসমন্বয়কারী ফাদার তিতুস মৃ। উদ্বোধনী নৃত্য, স্বাগত ভাষণ ও শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্যদিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরপর 'যুব এনিমেটরদের ভূমিকা, গুরুত্ব ও করণীয়' বিষয়ে উপস্থাপন করেন ফাদার অশেষ মার্শেলিউস দিও। এরপর দলীয়ভাবে যুব এনিমেটর বা স্বেচ্ছাসেবকদের গুণাবলী, প্রতিবন্ধকতা, উত্তরণের উপায় ও করণীয় বিষয়ে খুবই ফলপ্রসূ আলোচনা ও উপস্থাপনা করা হয়। এরপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বিজন কুবি। রাতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর সকালে ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। যুবদের উদ্দেশে তার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে তিনি তাদের সংকীর্ণ ও ভ্রান্ত পথ অতিক্রম করে অন্যের কথা ভাবতে ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে উৎসাহিত করেন। 'কাউন্সিলিং পদ্ধতি, গুরুত্ব ও কৌশল' এর ওপর সেশন পরিচালনা করেন সিস্টার যোসেপিন রোজারিও এসএসএমআই। 'যুব নেতৃত্ব, গুরুত্ব ও করণীয়' বিষয়ের ওপর উপস্থাপন করেন ফাদার উইলসন জাম্বিল। 'কোভিড-১৯ মহামারিতে যুব সচেতনতা ও করণীয়' বিষয়ে উপস্থাপন করেন ফাদার বাইওলেন চাম্বুগং। প্রশিক্ষণ বিষয়ে মূল্যায়ন ও পরবর্তী কার্যক্রমে ফলপ্রসু ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতির মধ্যদিয়ে দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়॥

Bangladesh Nazarene Mission

Vacancy Announcement

Bangladesh Nazarene Mission is inviting applications from qualified candidates for **Agriculture & Livilihood Project** which will be implemented in the Northern part of Bangladesh. The requirements for the positions are given below:

SL	Details of position	Qualification and competencies	Major responsibilities
1	**Project Officer** **Age:** Maximum 45 years **Gender:** Any **Job Location:** Birol, Dinajpur **Salary:** Negotiable **No. of Position: 1**	a. Masters with 3-5 years' experience on Agriculture and Livelihood project; b. Good command both in English & Bangla; c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application; d. Knowledge of Project Management, coordination, leadership, community engagement and righs based approach.	a. She/e will ensure the effective implementation of the project in line with approved proposal and budget; b. Sh/e will supervise the subordinate field staff to perfor their duties and responsibilities; c. Sh/e will maintain linkage with Govt. and Non-Govt. service providers on Agriculture and Livelihood issues; d. Sh/e will Prepare monthly fund requisition, progress report, case story, and other necessary documents as required by the project.
2	**Gender Inclusion Officer** **Age:** Maximum 40 years **Gender:** Female **Job Location:** Dhaka (approximate 40% travel) **Salary:** Negotiable **No. of Position: 1**	a. Masters with 3-5 years' experience on Gender Rights related project; b. Good command both in English & Bangla; c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application; d. Knowledge of Human Rights, women empowerment, leadership, community engagement and righs based approach.	a. Involve all level of project interventions those are relevent for gender cross-cutting and gender transformative; b. Support project team to promote equity and inclusion integration into program intervention; c. Provide guidance on integrating gender specific requirements in designing, planning and implementation of project interventions; d. Support M & E systems to ensure gender and inclusivity are reflected in project's output, outcome and impact level indicators.
3	**Nutritionist** **Age:** Maximum 40 years **Gender:** Any **Job Location:** Dhaka (approximate 40% travel) **Salary:** Negotiable **No. of Position: 1**	a. Masters/Diploma on Food Science/Nutrition with 3 years' experience; b. Good command both in English & Bangla; c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application; d. Knowledge of community dietary habit, food consumption and food security issues.	a. Building nutritional knowledge of household base Project Participants' group b. Integrate health and nutrition aspects of the project's objective to improve access to and use of nutritious foods. c. Work with Agriculturist to provide technical input for diversified household food production and consumption and nutrition-sensitive agriculture extension materials and activities. d. Support to integrate nutrition related M & E data in the project M & E system.
4	**Monitoring Officer** **Age:** Maximum 45 years **Gender:** Any **Job Location:** Dhaka (approximate 50% travel) **Salary:** Negotiable **No. of Position: 1**	a. Masters with 3-5 years' experience on Participatory Monitoring and Evaluation; b. Good command both in English & Bangla; c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application.	a. Sh/e will primarily responsible for collect the field-based monitoring data periodically using necessary monitoring tools comprising project performance indicators; b. Sh/e will monitor and facilitates the tracking of the project compared to the planned time frame and qualitative-quantitative progress of the project. c. Prepare periodic M & E reports with proper explanations and justifications on M & E findings including recommendations and submit to the management.
5	**Agriculturist** **Age:** Maximum 40 years **Gender:** Any **Job Location:** Birol, Dinajpur **No. of Position: 1**	a. Graduate/Diploma in Agriculture with 2 years' experience in Field. b. Diverse knowledge of livelihood project c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application. d. Willing to stay field office area.	a. Sh/e will implement the agricultural related activities in the field at community level; b. Sh/e will train and building capacities of the Project Participants and local communities on improved agricultural practices as designed in the project plan; c. Sh/e will monitor the progress of the agriculture activities inline with project goal and objectives and prepare regular update report on it and submit to PO; d. Building rapport and linkages with GO and NGO agriculture service providers.
6	**Accounts Officer** **Age:** Maximum 40 years **Gender:** Any **Job Location:** Birol, Dinajpur **Salary:** Negotiable **No. of Position: 1**	a. Graduate on Accounting with 2-3 years' experience in NGO Accounts with practical experience on Tally software b. Good command both in English & Bangla c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application. d. Willing to stay field office area	a. Perform the project's financial transection/activities following organizational finance policy; b. Collect bills, vouchers and other financial documents relavent for project accounts; c. Input financial data to the accounting software (Tally 9) according to the Head Office instruction; d. Ensure the Tax/VAT calculation, deduction as per NBR rules and timely deposited those to Treasury; e. Prepare and submit financial report timely; f. Perform any other duties assigned by the supervisor/authority.
7	**Field Facilitator** **Age:** Maximum 40 years **Gender:** Any **Job Location:** Birol, Dinajpur **Salary:** Negotiable **No. of Position: 6**	a. Graduate or HSC with 3-5 years' experience in NGO on Food security and Nutrition related project b. Diverse knowledge of Livelihood projects c. Requires knowledge of using personal computers including Microsoft Office Application	a. Sh/e will organize day to day field activities according to the project action/operation plan; b. Building good rapport with the communities and strongly mobilize the project participatnts and stakeholdes; c. Sh/e will coordinate with community representatives, leaders and other stakeholders including Govt and NGO's; d. Perform any other responsibilities as guided by supervisor.

If you feel that your qualification and experience meet the requirements, please send the completed Job Application and CV to **hrd@nazarene.org.bd** OR, send the printed copies to HRD, BNM, House # 16, Road # 14, Sector # 12, Uttara, Dhaka-1230 by **October 19, 2020, within 5:00 pm.** Only short-listed candidates will be called for an interview. Incompleted application will not be considered and the organization reserves the rights to reject any application or cancel or postpone the recruitment process without clarification.

প্রকাশনার গৌরবময় ৮০ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৫
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৫
❖ ২৭ সেপ্টেম্বর - ৩ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ১২ - ১৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 35
Regd. No. DA-33
❖ 27 September - 3 October, 2020, ১২ - ১৮ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

দেওগাঁও গ্রামে কলকাতার সাধ্বী তেরেজার নামে নতুন গির্জা নির্মাণে আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লীর আওতাধীন দেওগাঁও গ্রামে সাধ্বী তেরেজার নামে একটি নতুন গির্জার নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পুরো কাজের একটি স্ট্র্যাকচার ডিজাইন ও বাজেট তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উদার ব্যক্তির নিকট থেকে আমরা অর্থ সংগ্রহ করছি। এত শুভ কাজের আপনাদের আর্থিক সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আপনাদের সাহায্য ছাড়া কাজটি সু-সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই আপনাদের কাছে এই পবিত্র কাজের জন্য আমরা কিছু আর্থিক সহায়তার আবেদন করছি।

দেওগাঁও গ্রামটি ধর্মপল্লী থেকে বেশ দূরে হওয়ায় বেশিরভাগ লোকই নিয়মিত গির্জায় আসতে পারে না। তাই গ্রামে নতুন একটি গির্জা তাদের প্রাণের দাবী। আশা করি আমাদের আবেদনটি আপনাদের বিবেচনায় এনে নতুন গির্জার জন্য আমাদের কিছু আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।

ধন্যবাদান্তে-
ফাদার আলবাট রোজারিও
ফাদার ভিনসেন্ট গমেজ
সিস্টারগণ
ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী ও দেওগাঁও গ্রামের খ্রিস্টভক্তগণ

বিজ্ঞ/১৫৭/২০

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে ধর্মীয় দ্রব্যাদির আকর্ষণীয় সম্ভার।

✶ রেডিয়ামের বিশেষ রকমের মূর্তি ✶ পানপাত্র ✶ আকর্ষণীয় নতুন ক্রুশ ও রোজারিমালা

✶ এছাড়াও সাধু-সাধ্বীদের জীবনী বই **এছাড়াও যা পাওয়া যাচ্ছে –**

❒ খ্রিস্টযাগ রীতি ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ ❒ যুগে যুগে গল্প ❒ সমাজ ভাবনা

আপনাদের পরিবার খ্রিস্টীয় আদর্শে গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় দ্রবাদি ব্যবহার করুন ও ধর্মীয় বই পড়ুন।

শিগ্রই পাওয়া যাবে

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রতিবেশী প্রকাশনী দৈনিক বাইবেল পাঠ (**বাইবেল ডায়েরী ২০২১ - BIBLE DIARY** - Daily Prayer Book) ভারত থেকে আমদানী করছে। তাই আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আজই অর্ডার দিন।

প্রতিবেশী প্রকাশনী প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আগামী **২০২১ খ্রিস্টাব্দের বাইবেল ভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার ছাপার প্রস্তুতি নিচ্ছে।** আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনটি প্রতিবেশী প্রকাশনীর ক্যালেণ্ডারে প্রকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com, Webpage link : www.weekly.pratibeshi.org**